# গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৮ বর্ষ ৩৪ সংখ্যা ১ - ৭ এপ্রিল ২০১৬ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর www.ganadabi.in আট পাতা মূল্য ঃ ২ টাকা


## শহিদ-ই-আজম ভগৎ সিং-কে ভোলানো যাবে না

'পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের দিন শেষ হয়ে এসেছে। এ লড়াই আমরা শুরু করিনি আমাদের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তা শেষ হবে না। যতদিন সাম্যবাদী প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা না হয় ততদিন এই যুদ্ধ চলতে থাকবে নিত্যনতুন উদ্যমে এবং অভেদ্য দৃঢ়তায়।' ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশে বলেছিলেন ভগৎ সিং।

গত ২৩ মার্চ অনেকেরই হয়ত চোখে পড়েছে সংবাদপত্রে একটি বিজ্ঞাপন। তিন যুবকের ছবি, আর মাঝখানে লেখা 'শহিদদের অভিবাদন'— প্রচারক কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক। ছবিগুলির কোনও পরিচয় দেওয়া নেই, তাঁদের সম্বন্ধে কোনও কিছু লেখাও নেই। দীর্ঘদিনের সরকারি পরিকল্পিত ঔদাসীন্যের পর হঠাৎ কেন এমন দায়সারা বিজ্ঞাপন! এ প্রশ্ন অনেককে ভাবিয়েছে।

কারণটা বুঝতে অসুবিধা হয় না। আজ থেকে ৮৫ বছর আগে ১৯৩১ সালের ২৩ মার্চ যে আত্মবলিদান ঝড় তুলে দিয়েছিল সেদিনের অবিভক্ত ভারতে। ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে তিন তরুণ প্রাণ ভগৎ সিং, সুকদেব ও রাজগুরু বজ্রনির্ঘোষে যে ইনকিলাব জিন্দাবাদ ধ্বনি তুলেছিলেন তাতে স্বয়ং গান্ধীজি থেকে শুরু করে বাঘা বাঘা কংগ্রেস নেতারা পর্যন্ত কেঁপে উঠেছিলেন। আর কেঁপে উঠেছিল ব্রিটিশ

*পাঁচের পাতায় দেখুন*

# লক্ষ লক্ষ বেকারের চাকরির ঘোষণা ভোট বৈতরণী পেরোতেই

রাজ্য সরকারের ৯০ শতাংশ কাজ নাকি প্রথম বছরেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। বাকি ১০ শতাংশ কাজও ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ। এমনটাই দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এখন তাঁর ঘোষণা, ১০০-র মধ্যে ২০০ শতাংশ কাজ আমরা করে ফেলেছি। সেই 'কাজ' কী? তার জেরে কি মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, রাজ্যে ৬৮ লক্ষ বেকারের কর্মসংস্থান তাঁরা করে ফেলেছেন।

নবান্নে দাঁড়িয়ে ৮ মাস আগে মুখ্যমন্ত্রী ২ লক্ষ সরকারি কর্মচারী ও শিক্ষক নিয়োগের ঘোষণা করেছিলেন। বলেছিলেন, গ্রুপ-সি এবং গ্রুপ-ডি-তে ৬০ হাজার করে কর্মচারী নিয়োগ করা হবে। ৭০ হাজার শিক্ষকও নিয়োগ হবে। মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতিতে বেকার ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রত্যাশা তৈরি হয়েছিল। রাজ্যের স্টাফ সিলেকশন কমিশন (এস এস সি) সূত্রে খবর, সরকারের ঘোষণার পর মাত্র আড়াই হাজার নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করতে পেরেছে কমিশন। শ্রম দপ্তরের হিসেবে, এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্ক থেকে নিয়োগের সংখ্যা পাঁচশোর সামান্য বেশি।

লক্ষ লক্ষ কর্মসংস্থানের ঘোষণা শুনলে মনে হবে কোনও যুবক-যুবতী আর বেকার নেই। সম্প্রতি সংবাদে (বর্তমান-২৫ মার্চ, ২০১৬) প্রকাশিত হয়েছে, ১১৩৩টি কেরানি পদের জন্য সাড়ে চার লক্ষ প্রার্থী আবেদন করেছেন। আবেদনপত্রের চাপ সামাল দিতে না পেরে পরীক্ষা নিয়ামক সংস্থার সার্ভার বিকল হয়ে গেছে, ফলে আবেদনের সময়সীমা আরও ৭ দিন বাড়াতে হয়েছে। এতে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা সাড়ে পাঁচ লক্ষ ছাড়িয়ে যাবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে কর্তৃপক্ষ। খোদ সরকারি সংস্থার দুটি পরিসংখ্যানই মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। এত সংখ্যক চাকরি দেওয়া হয়ে গেছে বলে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পরও কেরানি পদের জন্য বেকার যুবকদের এমন হাহাকার প্রমাণ করে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা আর বাস্তবে কোনও মিল নেই।

কিছুদিন আগে উত্তরপ্রদেশে ৩৬৮টি পিওন পদের জন্য ২৩ লাখ কর্মপ্রার্থীর আবেদনপত্র জমা দেওয়ার সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। এর মধ্যে ২৫৫ জনের ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ডিগ্রি আছে এবং ২৫ হাজার আবেদনকারী মাস্টার ডিগ্রি পাশ করেছেন। এ রাজ্যে তৃণমূলের শাসনের শুরুর দিকে কনস্টেবল পদে চাকরির জন্য হাজার হাজার কর্মপ্রার্থীর দৌড়ে কলকাতার হেস্টিংসে দীর্ঘক্ষণ রোদের মধ্যে পরীক্ষার জন্য অপেক্ষা করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন এক যুবক। বাড়িতে সে বলে এসেছিল, চাকরির চিঠি নিয়েই ফিরব। চাকরির খবরের বদলে এল ছেলের মৃত্যুর খবর।

শুধু এ রাজ্য বা উত্তরপ্রদেশ নয়, খোঁজ নিলেই দেখা যাবে সব প্রদেশেরই একই অবস্থা। শুধু এই ভয়ঙ্কর দুরবস্থাকে অস্বীকার করে কর্মসংস্থানের মিথ্যা ঘোষণা করে চলেছে ক্ষমতালোভী দলগুলি। কর্মসংস্থানের এই বিপুল ঘোষণা বাস্তবে কতখানি মিথ্যা তা মাঝে মাঝে মুখ্যমন্ত্রীর মুখের কথাতেই প্রকাশ হয়ে পড়ে। উত্তরবঙ্গের মাদারিহাটের এক সভায় মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাসবাণী শুনিয়েছেন, কাজ না পেলে ক্ষতি কী, বেকাররা চায়ের দোকানে কাজ করুক, মাটি কাটুক, তেলেভাজা বিক্রি করুক। এমনকী তিনি তাঁর পাড়ায় কোন যুবককে নাকি তেলেভাজা বিক্রি করে অনায়াসে মাসে ৪০-৫০ হাজার টাকা আয় করে দোতলা-তিনতলা বাড়ি করতে দেখেছেন! যদিও রাজ্যের আর কেউ এ জিনিস দেখেছেন বলে জানা নেই।

*চারের পাতায় দেখুন*

## তমলুকে নির্বাচনী প্রচার

# 'এতকালের বামপন্থী হয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট মানতে পারছি না'

সিপিএম নেতারা ভেবেছিলেন, কংগ্রেসকে দিয়ে তাঁদের ফুটো নৌকোটা সারিয়ে নেবেন। আর তা দিয়েই নির্বাচনী বৈতরণী দিব্যি পার হয়ে যাবেন। কংগ্রেসের নৌকো তো আগেই ডুবেছে। এই সুযোগে তারা সিপিএমের নৌকোয় জাঁকিয়ে বসেছে। কিন্তু নৌকো তীরে ভিড়বে তো? নাকি মাঝ নদীতেই ডুববে? সিপিএম নেতারা বলছেন, তাঁরা কংগ্রেসের সঙ্গে এই বকচ্ছপ জোট করেছেন তৃণমূলকে হঠিয়ে ক্ষমতায় বসার জন্য। তাঁরা যাকে শিলিগুড়ি মডেল বলছেন, তাতে তো বিজেপিতেও অরুচি দেখা যায়নি। মোদ্দা কথা ক্ষমতায় ফেরা চাই। আর এই লোলুপতার উগ্রতায় প্রলেপ দিতেই বলা হচ্ছে জোট হয়েছে উভয় দলের নিচের তলার চাপে। সত্যিই কি তাই? দেখা যাক কেমন ভাবে নিচ্ছেন এই জোটকে সিপিএম-কংগ্রেস দলের কর্মী-সমর্থকরা, যাঁরা চিরকাল একে অপরকে কেউ অগণতান্ত্রিক, স্বৈরাচারী, চোর, দুর্নীতিগ্রস্ত, কেউ অত্যাচারী, নীতিহীন বলতেই অভ্যস্ত। রাজ্যের সাধারণ মানুষ, যাঁরা এদের পরস্পর 'ভয়ঙ্কর বিরোধী' হিসাবেই দেখতে অভ্যস্ত, তাঁরাই বা কেমন ভাবে নিচ্ছেন এই জোটকে?

এ রাজ্যে স্বাধীনতার পর থেকে দীর্ঘ সময় শাসন ক্ষমতায় থেকেছে কংগ্রেস। যত দিন গেছে ততই স্বাধীনতা সম্পর্কে মানুষের মোহভঙ্গ হয়েছে। মূল্যবৃদ্ধি থেকে দুর্নীতি, বেকারি থেকে শিক্ষা-স্বাস্থ্য, কোনও প্রতিশ্রুতিই কংগ্রেস রক্ষা করতে পারেনি। শুধু শাসকদের চামড়ার রঙ বদলেছে, মানুষের দুরবস্থা বদলায়নি, বরং তা আরও বেড়েছে। বামপন্থীরা কংগ্রেসি অপশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলেছে। ট্রামভাড়া বৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলন, বাংলা বিহার সংযুক্তির চেষ্টার বিরুদ্ধে আন্দোলন, শিক্ষক আন্দোলন, দুর্ভিক্ষ-মূল্যবৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলন প্রভৃতি সবগুলিই বামপন্থীদের নেতৃত্বে গড়ে উঠেছে। ১৯৫৯ সালে কলকাতায় খাদ্যের দাবিতে বুভুক্ষু মানুষের আন্দোলনে কংগ্রেস সরকারের পুলিশ শুধু লাঠিপেটা করে ৮০ জন কৃষককে হত্যা করেছিল। '৬৬ সালের খাদ্য আন্দোলনে উত্তাল হয়েছে মহানগরী সহ গোটা বাংলা। সেই আন্দোলনের শহিদ নুরুল ইসলাম, আনন্দ হাইতের নাম প্রতিটি বামপন্থী কর্মী জানে। এই সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ বাংলার মানুষ বিপুল ভোটে জিতিয়েছিল বামপন্থীদের। '৬৭-তে বামপন্থীদের যুক্তফ্রন্ট সরকারকে অগণতান্ত্রিক ভাবে ফেলে দিয়েছিল কংগ্রেস। ভোটের নামে প্রহসন হয়েছিল '৭২ সালে। বামপন্থীরা সাজানো বিধানসভা বয়কট করেছিল। '৭৫-এ জরুরি অবস্থা জারি করে সারা দেশে গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করেছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। পাড়ায় পাড়ায় সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল পুলিশ ও কংগ্রেসি গুন্ডাবাহিনী। বামপন্থী কর্মীরা এলাকাছাড়া হয়েছিলেন, কারারুদ্ধ হয়েছিলেন, অত্যাচারিত হয়েছিলেন, তাঁদের পরিবারগুলিকে অত্যাচারিত

*দুয়ের পাতায় দেখুন*

# কংগ্রেসের সঙ্গে জোট মানতে পরছি না

*একের পাতার পর*

হতে হয়েছিল। এই সময়টা গণতন্ত্রের ইতিহাসে কালো দিন হিসাবে এখনও চিহ্নিত হয়ে আছে। স্বাভাবিক ভাবেই কংগ্রেসের কথা উঠলেই তার জনবিরোধী, অত্যাচারী, অগণতান্ত্রিক এই রূপটাই প্রথম ভেসে ওঠে। এ ছাড়া কংগ্রেসই এ দেশে বিশ্বায়ন তথা উদারনীতির প্রবর্তক, যা পুঁজিপতিদের পুঁজিই শুধু বাড়ায়নি, গরিবের গরিবিও বাড়িয়েছে। এসমা, নাসা, টাডা, আফস্পা, ইউ এ পি এ সহ যত কালা কানুন প্রায় সবই কংগ্রেসের জারি করা।

সিপিএমের অপেক্ষাকৃত নবীন কর্মী-সমর্থকরা রাজ্যে কংগ্রেসের এই অপশাসন প্রত্যক্ষ না করলেও অপেক্ষাকৃত প্রবীণদের অনেকেই কংগ্রেস আমলের অত্যাচারের প্রত্যক্ষ সাক্ষী, অনেকেই ভুক্তভোগী। কলকাতার ঢাকুরিয়া এলাকার তেমনই একজন ব্যক্তি এস ইউ সি আই (সি)-র এক কর্মীকে কাছে পেয়ে বললেন, কংগ্রেসি অত্যাচারের সেই দিনগুলো কী করে ভুলবো, কত রাত বাড়িছাড়া থেকেছি, পুলিশের-কংগ্রেসি গুন্ডাদের তাড়া খেয়েছি। নেতারা সে-সব ভুলে গেলেন? আসলে এই সব নেতারা দীর্ঘদিন মন্ত্রীত্বের গদিতে থাকতে থাকতে আমাদের মতো নিচের তলার সাধারণ কর্মী-সমর্থকদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন, তাই তাদের মন-মানসিকতা বুঝতে পারছেন না। নিচের তলার জোটের নামে এই নেতারা আসলে ওপর তলার জোটকেই আমাদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছেন। প্রবীণ মানুষটি ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, কংগ্রেস কি বিশ্বাসযোগ্য দল? ভোটের পরে হয়ত দেখবেন তৃণমূলের সঙ্গেই আবার জোট করেছে, ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে আমাদের। তখন দলের অবস্থাটা কী দাঁড়াবে? নেতারা যে কেন এ-সব বুঝছেন না! তাঁর গলায় নেতৃত্বের প্রতি অনাস্থার সুর ঝরে পড়ে। বললেন, আপনাদের লাইনটাই ঠিক। আপনারাই সঠিক বামপন্থী। ফোন নম্বর দিয়ে বললেন, যোগাযোগ করবেন।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার একটি এলাকায় এমনই একদল বামপন্থী মানুষ কংগ্রেসের সঙ্গে জোটের সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হয়ে নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) নেতৃত্বের সাথে বৈঠকে বসেছিলেন। বললেন, নেতারা গদির লোভে কংগ্রেসের চরিত্র ভুলে যেতে পারেন, আমরা পারি না। বললেন, আমরা মনে-প্রাণে বামপন্থী। যতদিন বাঁচব, বামপন্থীই থাকব। তিরিশটা দেওয়াল চুনকাম করেছিলেন তাঁরা। যখন শুনলেন কংগ্রেসের সাথে নেতারা জোট করেছেন, সে দেওয়াল আর লেখেননি। এস ইউ সি আই (সি) নেতাদের বললেন, কর্মীদের বলুন, দেওয়ালগুলো লিখে দিতে। তাঁদেরই মধ্যে প্রবীণ একজন ক্ষোভের সাথে বললেন, দেখেছেন, কাস্তের মধ্যে হাত এঁকেছে। কোনও বামপন্থী মানুষ এ জিনিস ভাবতে পারে! কতখানি অধঃপতন হলে তবে এ কাজ করতে পারে! মানুষটির বুকের মধ্যে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

কলকাতার মানিকতলা বাজারে ভোটের প্রচার করছিলেন এস ইউ সি আই (সি) কর্মীরা। এগিয়ে এসে লিফলেট নিলেন একজন। লিফলেটে দলের প্রার্থীর নাম দেখেই বললেন, আমি একজন বামপন্থী কর্মী। এখনও শরীরে কংগ্রেসি গুন্ডাদের মারের দাগ রয়েছে। বামপন্থীদের অনেক রক্ত ঝরিয়েছে ওরা। সে দলের সাথে ঐক্য? সে ঐক্য মানতে হবে? পারব না। এস ইউ সি আই (সি) কর্মীটি বললেন, আমরা বামপন্থার মর্যাদা রক্ষায় লড়ছি। আপনাদের সাহায্য প্রয়োজন। উত্তরে তিনি বললেন, আপনাদের সম্পর্কে সবই জানি, দীর্ঘদিন ধরেই তো দেখছি। ভুল রাস্তায় জীবনের এতটা সময় চলে গেল। আমাদের উচিত এখন আপনাদের সঙ্গেই যোগ দেওয়া। তাঁর চোখে-মুখে প্রতারিতের যন্ত্রণা। যে নেতৃত্বের উপর নির্ভর করেছিলেন, বিশ্বাস করেছিলেন, সেই নেতৃত্বের আসল রূপটা প্রকাশ হয়ে পড়তেই নিজেকে প্রতারিত নিঃস্ব মনে হচ্ছে। এত দিনের এত পরিশ্রম, স্বপ্ন দেখা সবই কি ব্যর্থ হয়ে গেল! হয়ত হয়ে গেল, আবার হয়ত একেবারে ব্যর্থ হয়নি, কঠিন মূল্য দিয়ে সত্যকে খুঁজে পেলেন। কর্মীটিকে নাম, ঠিকানা দিয়ে বললেন, বাড়িতে আসবেন, যোগাযোগ রাখবেন।

উত্তর কলকাতার লাটুবাবুর বাজারে দলের প্রচার চলছিল। বাজার করতে এসেছেন কলেজ স্ট্রিটের এক নামী স্কুলের জনৈক শিক্ষক। তাঁর হাতে দলের লিফলেট দিতেই তিনি বলে উঠলেন, না না, এখন সবার আগে দরকার তৃণমূলের মতো ভয়ঙ্কর শক্তিকে সরানো, তারপর অন্য কথা। উত্তরে কর্মীটি বললেন, আমরাও তো চাই তৃণমূলকে সরাতে। সেই জন্যই তো আমরা চেয়েছিলাম বামপন্থীরা ঐক্যবদ্ধ হই, তৃণমূলের দুর্নীতি-অপশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলি। কিন্তু আন্দোলনে এলই না সিপিএম নেতৃত্ব, কংগ্রেসের সাথে চলে গেল। শিক্ষক উত্তেজিত হয়ে বললেন, ঠিকই করেছে, এখন প্রধান শত্রুর বিরুদ্ধে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। কর্মীটি ধীর গলায় বললেন, তৃণমূলকে সরানো তো অবশ্যই দরকার। কিন্তু সে কি পুঁজিপতি শ্রেণির সবচেয়ে বিশ্বস্ত দল কংগ্রেসকে সাথে নিয়ে? তৃণমূল একটা আঞ্চলিক পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষাকারী দল। কংগ্রেস জাতীয় পুঁজিপতিদের দল। তৃণমূলকে সরানোর নামে কংগ্রেসকে এ রাজ্যে বাঁচিয়ে তোলা কি কোনও বামপন্থী দলের নীতি হতে পারে? খানিকটা যেন থতমত খেয়ে গেলেন শিক্ষকমশাই। বললেন, না, না, এই ভয়ঙ্কর শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এখন আর নীতি-টিতি দেখলে চলবে না। আগে তাকে সরাতে হবে, তার পরে অন্য কথা। কর্মীটি বললেন, কিন্তু নীতি-আদর্শ বাদ দিলে একটি বামপন্থী দলের আর থাকলো কী? আর পাঁচটি বুর্জোয়া-পেটি বুর্জোয়া দলের সাথে পার্থক্যই বা কী থাকে? এবার যেন শিক্ষকমশাই কী ভেবে একটু নরম হলেন। কর্মীটি বললেন, আজ দেশের সকল দুরবস্থার জন্য কংগ্রেসের সত্তর বছরের শাসনই দায়ী নয় কি? কংগ্রেসের শাসনে ধনীর ধন আর নির্ধনের দুরবস্থা চরম অবস্থায় পৌঁছায়নি কি? কংগ্রেসের আমলেই তো ছোট-বড় মিলিয়ে কয়েক শত দাঙ্গা হয়েছে। আজ পর্যন্ত যত অগণতান্ত্রিক কালা-কানুন জারি হয়েছে তার সবই প্রায় কংগ্রেস করেনি কি? জরুরি অবস্থা জারি করে গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ তো কংগ্রেসই করেছিল। এ-সব তো আপনারাও মনে করেন। সেই কংগ্রেস কি বামপন্থীদের গণতান্ত্রিক লড়াইয়ে মিত্র হতে পারে? উত্তরে যেন আর কথা খুঁজে পেলেন না শিক্ষক। কিছুক্ষণ থেমে বললেন, কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করাটা উচিত হয়নি না হয় মানলাম, কিন্তু এই সরকারকে সরানো দরকার। কর্মীটি বললেন, তা নিয়ে তো আমরা একমত। গণআন্দোলনের রাস্তা ছেড়ে অনৈতিক উপায়ে তো তা হতে পারে না। কর্মীটি কমরেড প্রভাস ঘোষের একটি আবেদন-পুস্তিকা তাঁর হাতে তুলে দিয়ে বললেন, অনুগ্রহ করে এই বইটি পড়ুন, আপনার আরও বহু প্রশ্নের উত্তর এর মধ্যে পাবেন।

বাজার করে বেরোচ্ছিলেন, প্রবীণ এক ব্যক্তি। লিফলেট দিয়ে দলের বক্তব্য বলতেই বললেন, আমার বয়স সত্তর বছর। প্রথমে সিপিআই, তারপর সিপিএম করছি। কিন্তু এটা কী করলেন নেতারা! চিরকাল জেনে এসেছি বামপন্থী আর দক্ষিণপন্থীরা আলাদা। বামপন্থীরা গরিব খেটে খাওয়া মানুষ, শ্রমিক কৃষক সাধারণ মানুষের জন্য লড়াই করে, সমাজ বদলানোর কথা বলে, আর দক্ষিণপন্থীরা এই ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে চায়, বড়লোকদের, পুঁজিপতি, শিল্পপতিদের স্বার্থ রক্ষা করে। যে বামপন্থীরা দুটো সিটের লোভে দক্ষিণপন্থীদের সাথে জোট করে তার মধ্যে আর পদার্থটা কী থাকল? না, না, নেতারা এ ভীষণ অন্যায় করেছেন। এ জিনিস কিছুতেই মানতে পারব না।

কংগ্রেসের সঙ্গে জোট যে আসলে নীতিকেই বিসর্জন দেওয়া, সেই খেদই ফুটে উঠল উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জের এক প্রবীণ বামপন্থী আইনজীবীর গলায়। বললেন, অভাবে পড়লে কি স্ত্রী-সন্তানকে বিক্রি করতে হবে! এই কাজটাই তো করল সিপিএম। এ জিনিস আমি ভাবতেও পারছি না। আপনাদের স্ট্যান্ড আমার খুব ভাল লেগেছে। ওই জেলারই সিপিএমের এক যুবকর্মীর গলায় ঝরে পড়ল একই সাথে ক্ষোভ এবং যন্ত্রণা। বললেন, নেতারা দলটাকে অনেক আগেই বিক্রি করে দিয়েছেন। আমরা দলের মধ্যেই লড়তাম, বলার চেষ্টা করতাম। নেতারা আমাদের সাথে চাকর-বাকরের মতো ব্যবহার করত। আজ বুঝেছি, এই কানাগলি থেকে দল আর বেরোতে পারবে না। বললেন, আমি দেওয়ালে লিখতে পারি, প্রয়োজন হলে আমাকে ডাকবেন।

নামকরা দৈনিকের এক জেলা সাংবাদিক। ছাত্রজীবনে এস এফ আই-এর নেতা ছিলেন। এস ইউ সি আই (সি)-র এক নেতার সাথে দেখা হতে বললেন, অতীতে আপনাদের অনেক বিরোধিতা করেছি। কিন্তু আপনারাই যে সাচ্চা বামপন্থী এ বার তা একেবারে সামনে এসে গেল।

বারুইপুর এলাকায় প্রচারে বেরিয়েছিলেন এস ইউ সি আই (সি) দলের কর্মীরা। পরিচয় হল এক প্রবীণ বামপন্থী মানুষের সঙ্গে। ছেলে এলাকার সিপিএম পরিচালিত পঞ্চায়েতের প্রধান। বললেন, এই বয়সে এসে এ-ও দেখতে হল! তোমরা এসো, আমি সমস্ত সাহায্য করব। আমার মতো অনেকেই এই সুবিধাবাদী জোট মানতে পারেনি। তাঁদের নিয়ে তোমাদের সাথে বসাবো। পাশের গ্রামেরই এক সিপিএম কর্মী বললেন, এতদিন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছি, আর আজ তাদেরই সাথে জোট! পাড়ায় পাড়ায় কংগ্রেসি গুন্ডাদের হাতে খুন হওয়া অসংখ্য কর্মীর শহিদ বেদিগুলো কি এখন নেতারা তুলে ফেলতে বলবেন? নেতাদের বুঝে নিয়েছি। এবার আপনাদেরই ভোট দেব। এই এলাকায় আপনাদের প্রার্থীকে নিয়ে আসুন, তাঁকে এলাকায় ঘোরান, আমরা সাথে থাকব।

একই সুর কংগ্রেসের নিচের তলার কর্মীদের মধ্যেও। দীর্ঘ সিপিএম শাসনে সমস্ত বিরোধী দলের কর্মী-সমর্থকদের উপর অত্যাচারের যে স্টিম রোলার চালানো হয়েছে, বিরোধী দলগুলির কর্মী সমর্থক তো বটেই, সাধারণ মানুষের স্মৃতিতেও তা এখনও টাটকা রয়েছে। বিরোধী দলের সমর্থক হওয়ার 'অপরাধে' বহু মানুষকে ন্যূনতম সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, একঘরে করা হয়েছে, চাষের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, হাত কেটে নেওয়া হয়েছে, বাড়ির মহিলারা ধর্ষিতা হয়েছেন, মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে জেলে পোরা হয়েছে, খুন করা হয়েছে। কংগ্রেসের নিচের তলার কর্মীরা নেতাদের উদ্দেশে তাঁদের ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন, বলছেন, ক্ষমতার লোভে সাধারণ কর্মীদের উপর সিপিএমের অত্যাচারের কথা না হয় নেতারা ভুলেই গেলেন, কিন্তু সিপিএমের তাড়ায় বর্ষার আলপথ ভেঙে এক কংগ্রেস নেতার সেই ঐতিহাসিক দৌড়ও কি নেতারা ভুলে গেলেন?

এর বাইরে রয়েছেন সাধারণ মানুষের বিরাট এক অংশ, যাঁরা পাঁচ বছর আগে এই সিপিএমের অপশাসনে অতিষ্ঠ হয়ে তাদের ক্ষমতা থেকে সরিয়েছেন। রাজ্যের মানুষের কাছে ৩৪ বছরের অপশাসনের জন্য কোনও দোষ স্বীকার না করে, ক্ষমা না চেয়ে কংগ্রেসের মতো দুর্নীতিগ্রস্ত, নীতিহীন একটি দলের সঙ্গে সিপিএম নেতৃত্বের জোট করে ক্ষমতায় ফেরার এই উদগ্র হ্যংলামিকে তারা ধিক্কার জানাচ্ছেন।

এরপরেও সিপিএম-কংগ্রেস নেতারা একাংশ সংবাদমাধ্যমের সাথে গলা মিলিয়ে 'নিচের তলার জোটের তত্ত্ব'ই প্রচার করবেন। কিছু লোককে হয়ত সাথেও পাবেন। কিন্তু যথার্থ বামপন্থী কর্মী-সমর্থক-দরদি যাঁরা, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবীদের বেশিরভাগ অংশ এই জোট থেকে দূরেই সরে থাকবেন এবং তাঁরা যে দূরে সরে যাচ্ছেন ক্ষমতা দখলের নেশায় মত্ত এই সমস্ত নেতারা তা বুঝতেও পারবেন না। এই কর্মী-সমর্থকরা এক কঠিন সময়ের পরীক্ষায় তাঁদের নেতৃত্বের সুবিধাবাদী, অবাম চরিত্রকে চিনে নিতে পারছেন, একই সাথে চিনে নিচ্ছেন যথার্থ বামপন্থী শক্তি এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-কে। ভালোবেসে কাছে টেনে নিচ্ছেন, বলছেন, আপনারাই বামপন্থার মর্যাদা রক্ষা করলেন। আমাদেরও মান রাখলেন।

## জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (সি) মালদা জেলার কালিয়াচক এলাকার পার্টি কর্মী, শ্রমিক সংগঠন এ আই ইউ টি ইউ সি মালদা জেলা কমিটির সভাপতি কমরেড অশ্বিনী কুমার মণ্ডল ২৪ ফেব্রুয়ারি আকস্মিক হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬২ বছর। তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে দলের জেলা সম্পাদক কমরেড গোপাল নন্দী, জেলা কমিটির সদস্য কমরেডস গৌতম সরকার ও অংশুধর মণ্ডল, মোটর ভ্যান ইউনিয়নের জেলা সম্পাদক কমরেড কার্ত্তিক বর্মন তাঁর বাসভবনে উপস্থিত হয়ে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান।

কমরেড অশ্বিনী কুমার মণ্ডল ২০০৫ সালে বিড়ি শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে আন্দোলন করতে গিয়ে তিনি এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের সাথে যুক্ত হন এবং বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি দলের বক্তব্য সকলের কাছে বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরতেন। বয়সে প্রবীণ হওয়া সত্ত্বেও নেতৃত্বের পরামর্শেই চলার চেষ্টা করতেন। ২০ মার্চ গোপালগঞ্জে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় এ আই ইউ টি ইউ সি জেলা সম্পাদক কমরেড অংশুধর মণ্ডল তাঁর চরিত্রের গুণাবলী তুলে ধরেন। স্মরণসভায় বিড়ি শ্রমিক, মোটর ভ্যান চালক ও স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

**কমরেড অশ্বিনী কুমার মণ্ডল লাল সেলাম**

## আসাম বিধানসভা নির্বাচন

# প্রতিদ্বন্দ্বী দুই জোটই জনস্বার্থবিরোধী

১২৬ বিধানসভা কেন্দ্র বিশিষ্ট আসাম রাজ্যে নির্বাচন দু'দফায় অনুষ্ঠিত হবে আগামী ৪ এবং ১১ এপ্রিল। গত ১৫ বছর ধরে এই রাজ্যে ক্ষমতায় রয়েছে কংগ্রেস। কংগ্রেসের শাসন জনজীবনের সংকট সমাধানের পরিবর্তে বহুগুণ বাড়িয়েছে। মূল্যবৃদ্ধি, ছাঁটাই, বেকারি, নারীর নিরাপত্তাহীনতা, কৃষক আত্মহত্যা, সাংস্কৃতিক অধঃপতন, দুর্নীতি ইত্যাদি ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। জাতীয় নাগরিকপঞ্জী তৈরির মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ বাংলা ভাষাভাষী জনগণ, বিশেষ করে সংখ্যালঘু জনগণের ভোটাধিকার হরণ করা, নানা বাহানা তুলে তাদের ডি ভোটার (ডাউটফুল) হিসাবে চিহ্নিত করা এবং তাদের সব গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত শুরু হয়েছে। আসামে যাঁরা বংশপরম্পরায় বসবাস করছেন, তাঁদেরও পর্যন্ত 'ডি ভোটার' বা সন্দেহজনক ভোটার আখ্যা দিয়ে বিদেশি হিসেবে চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার করা এবং ডিটেনশন ক্যাম্পে চালান করা হচ্ছে। তারপর তাঁদের 'পুশব্যাক' করে পাঠানো হচ্ছে বাংলাদেশে। ফলে বাংলা ভাষাভাষী লক্ষ লক্ষ জনগণ রাজ্যে চরম আতঙ্কের মধ্যে ব. যে. ছেন। উগ্র প্রাদেশিকতাবাদী শক্তি অসম গণপরিষদ (এজিপি)-র চাপে কংগ্রেস সরকারের মদতে এই ষড়যন্ত্র চলছে। এর বিরুদ্ধে আসামে একমাত্র প্রতিবাদী শক্তি এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)। এস ইউ সি আই (সি) বিদেশি অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে। কিন্তু বিদেশি বিতাড়নের নামে প্রকৃত ভারতীয় নাগরিকদের বিতাড়নেরও বিরুদ্ধে।

*কাছাড়ের শিলচর, লক্ষ্মীপুর ও ধলাই কেন্দ্রের জন্য মনোনয়ন জমা দিতে চলেছেন যথাক্রমে কমরেডস প্রদীপ কুমার দেব, জয়সিং ছত্রী ও গৌরচন্দ্র দাস*

গত লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে বিজেপি জোরের সাথে বলেছিল, ক্ষমতায় এলে তারা বিদেশি অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়িত করবে। অসমীয়াভাষী জনগণ বিদেশি বিতাড়নের এই প্রতিশ্রুতিতে আস্থা ও বিশ্বাস রাখে। ইতিপূর্বে এই ইস্যুতেই তারা দু'বার এজিপিকে ক্ষমতায় বসিয়েছিল। কিন্তু এজিপি এই প্রতিশ্রুতি পালন করতে পারেনি। বিজেপি তা পালন করবে এই আশায় তারা বিজেপিকে সমর্থন করে। ফলে আসামের ১৪টি লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে বিজেপি ৭টিতে জিতে যায়। কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন হয় বিজেপি সরকার। কিন্তু ক্ষমতায় বসার দেড় বছর পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এক নির্দেশিকা জারি করে বলে, প্রতিবেশী বাংলাদেশ থেকে যারা ধর্মীয় কারণে এখানে আসতে বাধ্য হয়েছে, সেই ধর্মীয় সংখ্যালঘু অর্থাৎ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষ আসামে থাকতে পারবেন। এই ঘোষণা থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায় বিদেশি বিতাড়নের নামে বিজেপি আসলে সংখ্যালঘু মুসলিমদের তাড়াতে চায়। এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে বিজেপির মুসলিম বিদ্বেষই শুধু নগ্ন হয়েছে তা নয়, তাদের হিন্দুপ্রীতির মুখোশও খসে পড়েছে। যে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টানদের ভারতে থাকার অনুমতির কথা নোটিশে বলা হয়েছে তাদের নাগরিকত্ব দেওয়ার বিষয়ে কিন্তু স্পষ্ট করে কিছু বলা হল না। এবার বিজেপি যে 'ভিশন ডকুমেন্ট' প্রকাশ করেছে তাতেও নাগরিকত্ব নিয়ে একটি কথাও বলা হয়নি। ফলে জনগণের সামনে আজ পরিষ্কার, বিদেশি অনুপ্রবেশকারী বিতাড়ন ইস্যুটি বিজেপি এবং এজিপির মতো ধুরন্ধর রাজনৈতিক দলের কাছে ভোটে জেতার ছল ছাড়া কিছু নয়। আর তাতে যদি মানুষের জীবন তছনছ হয়ে যায়ও তাতেও তাদের কিছু যায় আসে না।

গত লোকসভা নির্বাচনে পুঁজিবাদী মিডিয়ার একতরফা তোলা মোদি হাওয়াকে কাজে লাগিয়ে বিজেপি রাজ্যে অর্ধেক আসনে জিতলেও মোদির 'আচ্ছে দিন'-এর প্রতিশ্রুতি শুধু অধরা তাই নয়, তার দু'বছরের শাসন জনজীবনে আচ্ছে দিনের পরিবর্তে 'অভিশপ্ত দিন' চাপিয়ে দিয়েছে। ফলে বিজেপির সেই হাওয়ায় এখন ভাটার টান। এই অবস্থায় কংগ্রেসের ১৫ বছরের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে জনমতকে কাজে লাগিয়ে ভোটে জিততে এই সাম্প্রদায়িক দলটি আরেক প্রাদেশিকতাবাদী, বিভেদকামী শক্তি এজিপি-র সঙ্গে নির্বাচনী জোট গড়ে তুলেছে। অসমীয়াভাষী জনগণের স্বার্থের স্লোগান তুলে এজিপি ইতিপূর্বে দু'বার ক্ষমতায় এলেও রাজ্যের মানুষ দেখেছেন এজিপি-র শাসন অন্যান্য বুর্জোয়া দলগুলির মতোই পুঁজিপতিদের স্বার্থেই পরিচালিত হয়েছে। এজিপির নেতা-মন্ত্রীরা দুর্নীতির পথে কোটি কোটি টাকা কামিয়ে নিয়েছেন। জনজীবনের সংকট সমাধানে তারা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ। একক শক্তিতে নির্বাচনে জেতার ক্ষমতা এজিপি-র নেই। তার জনসমর্থনের ভিতে ক্ষয় ধরেছে। ধরারই কথা। বুর্জোয়াদের স্বার্থরক্ষার রাজনীতি করলে কারও পক্ষেই জনগণের কল্যাণ করা, বিশেষ করে মূল্যবৃদ্ধি-বেকারত্ব ইত্যাদি জনগণের মৌলিক সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। এই অবস্থায় নির্বাচনে ফায়দা তুলতে এজিপি সাম্প্রদায়িক দল বিজেপির সঙ্গে নির্বাচনী জোটে সামিল হয়েছে।

এই জোটের আরেক শক্তি বড়ো পিপলস ফ্রন্ট (বিপিএফ)। বিপিএফের নেতারা এক সময় এজিপির প্রাদেশিকতাবাদী আন্দোলনের মধ্যেই ছিলেন। সেই বিভেদমূলক রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের ধারায় ১৯৮৫ সালে এজিপি ক্ষমতাসীন হয়। তারপর অসমীয়াভাষীর স্বার্থ দেখার নামে সরকার ঘোষণা করে আসামে সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই পড়াশুনার মাধ্যম হবে অসমীয়া ভাষা। এই ঘোষণায় বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতিগোষ্ঠী, যাদের মধ্যে তাদের মাতৃভাষা বিকাশের আকাঙ্ক্ষা ছিল, তারা প্রমাদ গোনে এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সামিল হয়। বড়ো জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় এই প্রতিবাদ ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়। সেখানে আসামকে আধাআধি ভাগ করে পৃথক বড়োল্যান্ডের দাবি তীব্র হয়ে ওঠে। বহু গণহত্যা, রক্তপাত, ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা সংগঠিত হয়। আসাম আবার পরিণত হয় বধ্যভূমিতে। এদের চাপে সরকার পৃথক রাজ্যের মতো স্বশাসিত এলাকা বিটিএডি (বড়োল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট) গঠন করে।

এই বিপিএফ কংগ্রেসকেই সমর্থন করত। ২০১১ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে গেলে বিপিএফ কংগ্রেসের কাছে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। ফলে এ বারের বিধানসভা নির্বাচনে বিপিএফ, বিজেপি-এজিপি জোটে সামিল হয়েছে।

ধুরন্ধর এই জোটকে যদি বুর্জোয়াদের 'এ টিম' বলা হয় তাহলে 'বি টিম'-এর দিকে রয়েছে কংগ্রেস এবং এ আই ইউ ডি এফ। সংখ্যাগুরু হিন্দুভোট হারানোর আশঙ্কায় কংগ্রেস এ আই ইউ ডি এফের মতো একটি চূড়ান্ত সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়িক দলের সঙ্গে সরাসরি জোট না করলেও সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলছে, যাতে ভোটের পর সরকার গঠনের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সাহায্যের প্রয়োজন হয়। এ আই ইউ ডি এফের অবশ্য এত রাখঢাকের প্রয়োজন নেই। নির্বাচনী সভায় সে পরিষ্কার বলছে, ভোটের পর সরকার গঠনে সে কংগ্রেসকে সমর্থন করবে। একই সাথে যেখানে এ আই ইউ ডি এফ প্রার্থী নেই সেখানে কংগ্রেসকে ভোট দেওয়ার জন্য মুসলিম জনগণের কাছে আহ্বান জানাচ্ছে।

এই দুই জোটের বা জোটশরিক দলগুলির না আছে কোনও জনস্বার্থবাহী নীতি, না আছে জনগণের সমস্যা নিয়ে কোনও দরদি মন। ক্ষমতার লোভ, গদির লোভ এদের দুটো শিবিরে সামিল করেছে। বুর্জোয়াদের এই দুই বিশ্বস্ত 'টিমের' দ্বারা জনস্বার্থে শাসন আদৌ পরিচালিত হতে পারে কি? এই অবস্থায় প্রয়োজন যথার্থ বামপন্থী ভাবধারায় জনজীবনের সমস্যা নিয়ে ধারাবাহিক আন্দোলন গড়ে তোলা। এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) এই আন্দোলন গড়ে তোলায় সচেষ্ট। অপ্রয়োজনীয় বিধান পরিষদ গঠনের বিরুদ্ধে আন্দোলন, সংখ্যালঘু জনগণের নাগরিকত্ব হরণের বিরুদ্ধে আন্দোলন, ব্রডগেজ রেল লাইন সম্প্রসারণের দাবিতে আন্দোলন সহ বিভিন্ন দাবিতে এস ইউ সি আই (সি) ধারাবাহিকভাবে আন্দোলন করে যাচ্ছে। সিপিএম, সিপিআই প্রমুখ বামদলগুলির অবামপন্থী ভূমিকা রাজ্যে বাম আন্দোলনের সামনে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম কিছু সিটের লোভে কংগ্রেসের মতো বুর্জোয়া দলের সঙ্গে যেমন এবার ঐক্য করেছে, আসামেও ১৯৭৭ এর নির্বাচন ও পরবর্তীতে কংগ্রেস, বিজেপির মতো শক্তির সঙ্গেও তারা বোঝাপড়া করেছে। ১৯৯৬ সালে উগ্র প্রাদেশিকতাবাদী শক্তি এজিপির মন্ত্রীসভায় সিপিআই সরাসরি যোগ দিয়েছিল, সিপিএম বাইরে থেকে সমর্থন জানিয়েছিল। আসামে সমাজবাদী পার্টি এবং ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টির কোনও গণভিত্তি না থাকলেও এই দুই দলকে ধর্মনিরপেক্ষ এবং গণতান্ত্রিক আখ্যা দিয়ে এদের সঙ্গে জোটবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা চালিয়েছে সিপিএম, সিপিআই। জনগণের সমস্যা নিয়ে আন্দোলনে তাদের উৎসাহ কম। সেই কারণে নাগরিকপঞ্জী নির্মাণের বিরুদ্ধে, বিধানপরিষদ গঠনের বিরুদ্ধে, রেললাইন সম্প্রসারণের দাবি ইত্যাদি প্রধান প্রধান বিষয়গুলি নিয়ে এস ইউ সি আই (সি)-র পক্ষ থেকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আহ্বান জানালেও তাদের তরফ থেকে সাড়া পাওয়া যায়নি। ফলে এস ইউ সি আই (সি) একক ভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এবং কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে শোষিত মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে সুদৃঢ় অবস্থান ও আন্দোলনের মাধ্যমে আসামে এস ইউ সি আই (সি)-র ক্রমাগত শক্তিবৃদ্ধি ঘটছে। কংগ্রেস, বিজেপি, এজিপি প্রভৃতি জাতীয় ও আঞ্চলিক বুর্জোয়া দলগুলির পাশাপাশি সিপিএম, সিপিআই প্রভৃতি বামদলগুলির ভূমিকাও আজ জনসমক্ষে উদঘাটিত। এই অবস্থায় মানুষ বিকল্প চাইছে। পুঁজিপতিদের পক্ষের দুই জোটের বিকল্প আপসপন্থী বামপন্থীরা হতে পারে না, সে বিকল্প সংগ্রামী বামপন্থীরা। পুঁজিবাদী শোষণ-অত্যাচার ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আন্দোলন তীব্রতর করতে, সংগ্রামী বামপন্থার স্বার্থে এস ইউ সি আই (সি) আসামে ১৫টি জেলায় ২৬টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। দলের রাজ্য সম্পাদক কমরেড চন্দ্রলেখা দাস এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থীদের টর্চ চিহ্নে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

## 'জরুরি অবস্থা আরএসএস-কে সাহায্য করেছে'

### কে এন পানিক্কর

মহাত্মা গান্ধী নিহত হওয়ার পর আরএসএস ও জনসংঘ ভারতের রাজনীতিতে ব্রাত্য হয়ে গিয়েছিল। কংগ্রেসের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর জারি করা জরুরি অবস্থা তাদের আবার ভারতীয় রাজনীতির মূল স্রোতে ফিরে আসতে সাহায্য করেছে — একথা বলেছেন প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ কে এন পানিক্কর। ১৪ মার্চ তিরুবনন্তপুরমে 'ভারতীয় জাতীয়তাবোধ ঃ তখন এবং এখন' শীর্ষক আলোচনাসভায় এ কথা বলেন তিনি। পানিক্কর বলেন, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এদেশে যে উদারনৈতিক ও ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হয়েছিল, তাকে হঠিয়ে হিন্দু মৌলবাদী জাতীয়তাবোধ কায়েম করার চেষ্টা করছে আরএসএস। ভারতীয় জাতি ও জাতীয়তাবোধের গণতান্ত্রিক-ধর্মনিরপেক্ষ-উদারনৈতিক চরিত্র পরিবর্তন করে তাকে ধর্মীয়-মৌলবাদী রূপ দেওয়ার সুপরিকল্পিত অপচেষ্টা চলছে ভারতে। ভারতীয় জাতি ও জাতীয়তাবোধের চরিত্র পরিবর্তন করার এই অপচেষ্টার বিরোধিতা করছেন যাঁরা, তাঁদের জাতীয়তাবিরোধী হিসাবে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তাঁদের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহের অভিযোগ তোলা হচ্ছে। এই সাম্প্রদায়িক ছকের সাফল্য বা ব্যর্থতা অনেকটাই নির্ভর করছে নাগরিক সমাজের প্রতিরোধের উপর। নাগরিক সমাজ কীভাবে এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে, তার উপর বিরাটভাবে নির্ভর করছে জাতির ভবিষ্যৎ।

অধ্যাপক পানিক্কর বলেন, ভারত রাষ্ট্র যে স্বৈরতন্ত্রের দিকে চলেছে, তার বেশ কিছু লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এ দেশ এখনও পর্যন্ত ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র হয়নি ঠিকই, কিন্তু কর্তৃত্ববাদ, ধর্মীয় ঘৃণা ও সন্ত্রাস ছড়ানো এবং সমালোচনা শুনতে না চাওয়ার যেসব প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, সেগুলি নিঃসন্দেহে ফ্যাসিবাদের চিহ্ন।

(সূত্র ঃ দ্য হিন্দু, ১৬ মার্চ, ২০১৬)

# এস ইউ সি আই (সি) সম্পর্কে প্রকাশিত কল্পিত কাহিনীর প্রতিবাদে

*এস ইউ সি আই (সি)-র দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদক কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার ১৮ মার্চ আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশের জন্য এই চিঠিটি পাঠান। সেটি এখানে প্রকাশ করা হল। সম্পাদক— গণদাবী*

আপনাদের পত্রিকার ১৩ মার্চের রবিবাসরীয়তে ১০ম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত প্রদ্যোত কুমার মণ্ডল-এর —'মার্কস বা হরি যাকে পাই তাকে ধরি' শীর্ষক রচনাটি সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলতে চাই।

লেখক সত্য-মিথ্যায় মিশিয়ে যে কৌশলে তাঁর বক্তব্য উপস্থিত করেছেন তাতে এ দেশের মানবতাবাদী সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের একটি মূল্যবান শিক্ষা স্মরণযোগ্য। তিনি বলেছেন, 'মিথ্যা পাপ, কিন্তু মিথ্যায়-সত্যে জড়িয়ে বলার মতো পাপ সংসারে অল্পই আছে।' প্রদ্যোতবাবু এ কথা সত্য বলেছেন যে, বিগত শতাব্দীর ছ'এর দশকে পশ্চিমবাংলায় খাদ্য আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। আমাদের দল এস ইউ সি আই (সি)-র প্রবীণ নেতা কমরেড সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে দক্ষিণ ২৪ পরগণায় সে আন্দোলন দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছিল এবং এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ঐতিহাসিক তে'ভাগা আন্দোলনের গতিবেগ। এরই ফলশ্রুতিতে দীর্ঘদিনের কংগ্রেসী শাসনের অবসানে পশ্চিমবাংলায় ১৯৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যুক্তফ্রন্ট সরকার। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, গণআন্দোলনের হাতিয়ার হিসেবে যখন যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন কংগ্রেসের মদতপুষ্ট জোতদারদের বছরের পর বছরের অন্যায়-অমানবিক শোষণের চাপে জর্জরিত খেতমজুর ও ভূমিহীন চাষিদের বর্গা অধিকার প্রতিষ্ঠা ও বেনাম জমি উদ্ধার করে গরিব চাষিদের মধ্যে বিলি করার কর্মসূচিতে জনজোয়ার সৃষ্টি হয়। সকলেই জানেন, তৎকালীন সময়ে জোতদাররা বেআইনিভাবে সিলিং-এর ঊর্ধ্বে বাড়ির কুকুর-বিড়াল-ছাগল অথবা যে জন্মায়নি এমন কল্পিত সন্তানদের নামে বেনামে জমি রাখতেন। সেই সিলিং বহির্ভূত বেনাম জমি উদ্ধার এবং গরিব চাষি-ভূমিহীন চাষিদের মধ্যে তার বিলিবণ্টন এই পশ্চিমবাংলার ঐতিহ্যমণ্ডিত বামপন্থী আন্দোলনের অন্যতম একটি প্রধান অঙ্গ ছিল।

লেখক প্রদ্যোত কুমার মণ্ডল যে সত্যটি তাঁর লেখায় গোপন করেছেন তা হল, তিনি, তাঁর পিতা দয়াল হরি মণ্ডল এবং পিতামহ পালান মণ্ডল রায়দিঘির খাঁড়ি অঞ্চল ছাড়াও কঙ্কনদিঘি ও নন্দকুমারপুর অঞ্চলে এই ধরনের প্রচুর বেনাম জমি রেখেছিলেন। অন্যান্য জোতদারদের মতোই চাষিদের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য তাঁর পিতার বা তাঁর বন্দুক না থাকলেও প্রদ্যোতবাবুর কাকা বিনয় মণ্ডলের বন্দুক ছিল। বেনাম জমি উদ্ধারের আন্দোলনে তাঁদের এই বেআইনি জমিতে কোথাও বর্গা অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কোথাও তা চাষিদের মধ্যে বিলি করা হয়। এই কারণেই সম্ভবত আমাদের দল সম্পর্কে তাঁর প্রবল ক্ষোভ। এটাও বোধ করি বলা অসঙ্গত হবে না যে, সেই বেনাম জমি হারানোর ব্যথা তিনি আজও ভুলতে পারেননি। তাই সত্যের পথ থেকে সরে গিয়ে প্রদ্যোতবাবু জনৈক 'বিশ্বনাথ বেরা ওরফে বিশু'র কাল্পনিক চরিত্র সৃষ্টি করেছেন তাঁর রচনায়। স্পষ্ট করেই এ কথা আমি দায়িত্ব নিয়ে দৃঢ়ভাবে বলতে চাই যে, সেই সময়ে এবং বর্তমানেও এই নামে এস ইউ সি আই (সি) দলের কোনও কর্মীর অস্তিত্ব নেই। ফলে 'বিশ্বনাথের' হরিনাম সংকীর্তন একটি বড়সড় কল্পনার কৌশলী ফসল ছাড়া আর কিছুই নয়। তার 'হরিনামই সত্য' — এই উপলব্ধির উল্লেখটি অবান্তরই শুধু নয়, অসত্যও বটে।

দ্বিতীয় যে অসত্য ভাষণ, তা সশস্ত্র বিপ্লবের ডাক দেওয়া এবং তার জন্য অস্ত্রচালনা প্রশিক্ষণ প্রসঙ্গে। এ কথা সর্বজনবিদিত যে আমাদের দল বর্তমান স্তরে গণআন্দোলনেরই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে এবং একটি সুনির্দিষ্ট নীতি নৈতিকতা ও মূল্যবোধের আধারেই তা গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করে। এই কর্মকাণ্ডে এই বাংলায় আমাদের দলের কত নেতা কর্মী শহিদের মৃত্যু বরণ করেছেন, কতজন পঙ্গু হয়েছেন তা সাধারণ মানুষের অজানা নয়। এই রায়দিঘিরই কিশোর সন্তান মাধাই হালদার ন'এর দশকে শহিদ হয়েছিলেন গণআন্দোলনের সৈনিক হিসাবে। গোটা বাংলা আলোড়িত হয়েছিল। মাধাই-এর মা — রায়দিঘিরই এক পল্লীরমণী হয়ে বেদনার জলভরা চোখে বলতে পেরেছিলেন, 'আমার এক মাধাই গেছে, হাজার মাধাই আছে'। প্রদ্যোতবাবুর দৃষ্টিতে এই সত্যটুকু যে কেন ধরা পড়ল না, তা নিশ্চয় তাঁর সততা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। কলেজে তিনি মার্কসবাদ পড়ানোর যে গর্ববোধ প্রকাশ করেছেন, সত্য-মিথ্যা আশ্রিত তাঁর রচনাটিতে সেই মহান মার্কসবাদের ভিত্তিতে মূল্যবোধের কোনও প্রকাশ প্রতিফলিত না হওয়াটা সত্যিই দুঃখজনক।

ফলে এক কথায়, প্রদ্যোতবাবুর রচনাটি ব্যক্তিগত বিদ্বেষ প্রসূত এবং বামপন্থী আন্দোলন, আমাদের দল ও মার্কসবাদকে কালিমালিপ্ত করার একটি সচেতন প্রয়াস। আরও উল্লেখ্য হল, মার্কস-এর সুযোগ্য উত্তরসূরি লেনিনের মূর্তিকে ভাঙা অবস্থায় ছবিতে প্রকাশ করে সেই ছবি সম্পর্কে রবিবাসরীয় কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে যে মন্তব্য করা হয়েছে, তাও প্রদ্যোতবাবুর অভিপ্রায়ের মতোই সচেতন প্রচেষ্টা বলেই মনে হয়। শুধু এইটুকু বলতে পারি, সত্যকে বিকৃত করার এই প্রচেষ্টা শেষ পরিণতিতে নিশ্চয়ই জয়ী হতে পারবে না। প্রদ্যোতবাবুদের একদিন এ কথা স্বীকার করতেই হবে।

# ডি এস ও করার অপরাধে ডাক্তারি ছাত্রদের ফেল করানো হল

অল ইন্ডিয়া ডি এস ও মেডিকেল ইউনিট এর পক্ষ থেকে রাজ্য সহ-সভাপতি ডাঃ মৃদুল সরকার ২২ মার্চ এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, 'এন আর এস মেডিকেল কলেজে অল ইন্ডিয়া ডি এস ও-র কলেজ ইউনিট সম্পাদক সুশোভন পাত্র, সভাপতি দেবপ্রিয় রায় সহ ৬ জন ছাত্রছাত্রীকে ডি এস ও করার এবং টি এম সি পি ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার অপরাধে যেভাবে এম বি বি এস পরীক্ষায় ফেল করানো হল তা এ রাজ্যে ছাত্র আন্দোলন দমনের ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক ঘটনা। শাসকদল ঘনিষ্ঠ কিছু শিক্ষক এই ন্যক্কারজনক ঘটনায় জড়িত।

এন আর এস মেডিকেল কলেজে একমাত্র বিরোধী ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও কলেজ ও হস্টেলে টি এম সি পি-র র‍্যাগিং, সন্ত্রাস ও অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলেছে। পরীক্ষা ব্যবস্থার দুর্নীতি রোধ সহ পরিকাঠামোর উন্নতির দাবিতে আন্দোলন চলছে। বিগত কলেজ নির্বাচনে সমস্ত আসনেই টি এম সি পি-র বিরুদ্ধে ডি এস ও প্রার্থী দিয়েছে। এতে ক্ষিপ্ত টি এম সি পি কলেজকে বিরোধীশূন্য করতে কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় ডি এস ও-র নেতা-কর্মীদের উপর নানাভাবে আক্রমণ চালাচ্ছে। ডি এস ও কর্মী শ্রাবন্তী বিশ্বাসকে টি এম সি পি নেতাদের দ্বারা শ্লীলতাহানির শিকার হতে হয়েছিল। দোষীরা এখনও শাস্তি পায়নি। শ্রাবন্তীর বোন থার্ড প্রফেশনাল পার্ট ওয়ান পরীক্ষার্থী বৈশালী বিশ্বাসকে

অপথ্যালমোলজি পরীক্ষায় বিভাগীয় প্রধান ফেল করিয়েছিলেন, আন্দোলনের চাপে শেষপর্যন্ত সে পাশ করে।

রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে খোদ কলকাতার বুকে একটি মেডিকেল কলেজে শাসকদলবিরোধী সংগঠন করার অপরাধে যেভাবে মেডিকেল ছাত্রছাত্রীদের ফেল করানো হচ্ছে তাতে সাধারণ মানুষ নির্ভয়ে তাদের মতামত ব্যক্ত করতে পারবে, এটা অলীক স্বপ্ন। আমরা দাবি করছি, বিচারবিভাগীয় তদন্ত করে শাসকদল ঘনিষ্ঠ যে সকল শিক্ষক এই ঘটনায় জড়িত তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে, পরীক্ষা ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনতে হবে, বিশেষ করে মৌখিক ও প্র্যাকটিকাল পরীক্ষার ডকুমেন্টেশন করতে হবে, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বন্ধ করে সকল ছাত্রের নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছভাবে পরীক্ষা নিতে হবে।

## কৃষক খেতমজুরদের ঝজ্জর জেলা সম্মেলন

***অল ইন্ডিয়া কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের পক্ষ থেকে কৃষক ও খেতমজুরদের নানা দাবিতে হরিয়ানার ঝজ্জর জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জেলা সম্পাদক নির্বাচিত হন কমরেড করতার সিং। সম্মেলন থেকে ২৩ জনের নতুন জেলা কমিটি গঠিত হয়।***

# লক্ষ লক্ষ বেকারের চাকরির ঘোষণা প্রতারণা

*একের পাতার পর*

এ থেকেই কর্মসংস্থানের চিত্রটি স্পষ্ট হয়ে যায়। বাস্তবে এই মুমূর্ষু পুঁজিবাদী ব্যবস্থা কাজের সুযোগকে ক্রমশ কমিয়ে দিচ্ছে। শিল্প-কারখানা বন্ধ। যে দু'একটা শিল্প গড়ে উঠছে তাও শ্রমনিবিড়ের বদলে পুঁজি-নিবিড়। ফলে তাতে কর্মসংস্থান হয় নগণ্য। তা সত্ত্বেও রাজ্যে রাজ্যে ক্ষমতাসীন দলগুলি বেকারদের নানারকম প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। নির্বাচন এলে কর্মসংস্থানের ভুরি ভুরি প্রতিশ্রুতি দেওয়াটাই দস্তুর। কী বিজেপি, কী তৃণমূল, কী সমাজবাদী পার্টি, কী সিপিএম, কী কংগ্রেস — সকলেই বেকারদের দুঃখে বিগলিত। বেকার যুবকদের ছলনায় ভুলিয়ে ভোটে বাজিমাত করাই সবার একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু যে শোষণমূলক পুঁজিবাদী সমাজের জন্য কর্মসংস্থানের এই অবস্থা, তার বিরুদ্ধে একটি কথাও এরা উচ্চারণ করছে না। একে টিকিয়ে রেখে এর পলিটিক্যাল ম্যানেজার হয়ে এরই সেবা করার প্রতিযোগিতায় নির্বাচনে লড়ছে এই ক্ষমতালোভী দলগুলি। তার জন্য মিথ্যা কর্মসংস্থানের টোপ দিচ্ছে।

২০১৪ সালে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, বছরে পাঁচ লাখ বেকারের চাকরি দেবেন। এর পরেও কর্মসংস্থানের কোনও সুযোগ না পেয়ে যুবকরা হতাশাগ্রস্ত, কর্মহীন চা-বাগানের বেকার শ্রমিক এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা অর্ধাহারে অনাহারে দিন কাটাচ্ছে, আত্মহত্যা করছে। চলতি বিধানসভার শেষ অধিবেশনে সরকারের লিখে দেওয়া ভাষণ পাঠ করে রাজ্যপাল বলেন, রাজ্যে অন্যান্য নানা উন্নয়নের পাশাপাশি কর্মসংস্থান হয়েছে বিপুল সংখ্যায়! চায়ের দোকানে বা হোটেলের কাজকেও তারা কর্মসংস্থানের তালিকায় ফেলেছেন হয়ত। এমন সব ঘোষণা বেকার যুবকদের সঙ্গে প্রতারণা ছাড়া কী?

এখন নির্বাচন সামনে এসে পড়ায় ৬৮ লক্ষ চাকরি দেওয়ার সরকারি ঘোষণা ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে প্রচার করা হচ্ছে। কোটি কোটি টাকা বিজ্ঞাপন দিয়ে তৃণমূল সরকার কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে পাঁচ বছরের বিরাট 'সাফল্য' তুলে ধরছে। বলা হয়েছে ২০১৩-১৪ আর্থিক বছরে সরকারি উদ্যোগে ১০ লক্ষ ২৪ হাজার ৫১২ জনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু কোথায় হয়েছে কেউ জানে না। এই সব প্রচারে টাকা খরচ না করে সেই টাকায় বেকার যুবকদের কোনও কাজের সংস্থান করলে তাদের পক্ষে মঙ্গলের হত।

ক্ষমতামত্ত দলগুলি যতই অস্বীকার করুক, বর্তমানের বাজার সংকটগ্রস্ত পুঁজিবাদী দুনিয়ায় কর্মসংস্থান ক্রমশ কমছে, চাকরির বাজার ক্রমাগত সংকুচিত হচ্ছে। উন্নয়নের নাম দেওয়া হয়েছে কর্মহীন বা জবলেস গ্রোথ। অর্থাৎ কাজের সুযোগ কম। কিন্তু তা সামনে এসে গেলে কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোটে বাজিমাত করা যাবে না। তাই সত্য আড়াল করতে প্রচারের জৌলুসে মানুষের দৃষ্টিকে ঘুলিয়ে দিয়ে ভোটে জেতার মরিয়া চেষ্টা করে চলেছে শাসক দলগুলি। এ ক্ষেত্রে ঝান্ডার রঙে কোনও পার্থক্য নেই। যেমন ৮০-র দশকে হলদিয়া পেট্রোকেমিকেলে ১ লাখ বেকারের চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী। বাস্তবে ৯০০ লোকের চাকরি হয়েছিল। বেকারদের নিয়ে এই ঠগবাজি বন্ধ করতে হলে সঠিক আদর্শভিত্তিক রাজনীতিকে হাতিয়ার করে আন্দোলন ছাড়া পথ নেই।

# ২৩ মার্চ দেশ জুড়ে ভগৎ সিং শহিদ দিবস পালিত

**গুজরাট ঃ** ২৩ মার্চ শহিদ-ই-আজম ভগৎ সিংয়ের ৮৫তম আত্মবলিদান দিবসে গুজরাটে ব আমেদাবাদ, সুরাট, ভদোদরা সহ বিভিন্ন এলাকায় ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও এবং যুব সংগঠন এ আই ডি

ওয়াই ও-র উদ্যোগে শহিদ স্মরণ কর্মসূচি পালিত হয়। আমেদাবাদের স্টেডিয়াম সুইমিং পুলের কাছে শহিদ বেদিতে মাল্যদান কর্মসূচি পালিত হয়। বক্তব্য রাখেন ডি ওয়াই ও-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড জয়েশ প্যাটেল। গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি

লনে চিত্র প্রদর্শনী, ব্যাজ পরিধান সহ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ডি এস ও-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড রিম্মি বাঘেলা ভগৎ সিং-এর জীবনসংগ্রামের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।

**দিল্লি ঃ** ২৩ মার্চ ডি ওয়াই ও-র নেতৃত্বে লালকেল্লা থেকে ফিরোজ শাহ কোটলা শহিদ পার্ক পর্যন্ত 'সংকল্প মার্চ' অনুষ্ঠিত

হয়। পার্কে শহিদ ভগৎ সিং, শুকদেব, রাজগুরুর মূর্তিতে মাল্যদান করা হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন কমরেডস ম্যানেজার চৌরাসিয়া, রাকেশ কুমার, রবি কুমার, দীপক কুমার প্রমুখ।

**আসাম ঃ** করিমগঞ্জে অল ইন্ডিয়া ডি ওয়াই ও, অল ইন্ডিয়া এম এস এস এবং অল ইন্ডিয়া ডি এস ও-র যৌথ উদ্যোগে ২৩ মার্চ শহিদ-ই-আজম ভগৎ সিং-এর শহিদ বেদিতে যথাযোগ্য মর্যাদায় মাল্যদান করা হয়। সকালে ভগৎ সিং-এর স্মারক ব্যাজ পরিধান, বিকেলে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।

সারা দেশের সাথে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলায় দলের ছাত্র যুব মহিলা সংগঠনের উদ্যোগে অসংখ্য জায়গায় বেদিস্থাপন, মাল্যদান, ব্যাজ পরিধান, আলোচনাসভা, ভগৎ সিংয়ের জীবন নিয়ে সিনেমা প্রদর্শনী প্রভৃতির মধ্য দিয়ে দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়।

# পরিচারিকা খুনের প্রতিবাদে মিছিল, অবরোধ

*পরিচারিকা ইয়াসমিনা গাজির ধর্ষণ ও খুনের প্রতিবাদে এ আই এম এস এসের উদ্যোগে ২৬ মার্চ দক্ষিণ ২৪ পরগণার বাইশহাটায় মিছিল এবং নতুনহাটে অবরোধ হয়। মিছিল থেকে দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি ওঠে।*

# শহিদ-ই-আজম ভগৎ সিং

*একের পাতার পর*

সাম্রাজ্যবাদ এবং ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণি। তাই এ দেশের শাসকরা চায় না ভগৎ সিং-এর চর্চা দেশে হোক। শুধু এখন নয়, স্বাধীনতার আগে থেকেই কংগ্রেসের গান্ধীবাদী আপসমুখী নেতৃত্ব, এ দেশের জাতীয় পুঁজিপতি শ্রেণি এবং ধর্মের ধ্বজাধারী হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তি আরএসএস ও মুসলিম সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি ভগৎ সিং-এর কার্যক্রমকে ভয় পেয়েছে। তাই আজ আরএসএস অনুগামী বিজেপি সরকার ভগৎ সিংকে ঘিরে দেশের মানুষের আবেগকে ঝেড়ে ফেলে দিতে না পেরে দায়সারা বিজ্ঞাপনেই বিষয়টিকে বন্দি করে রাখতে চেয়েছে। কিন্তু শুধু এ দেশে নয় সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশেই ভগৎ সিং-এর নাম আজও ছাত্র-যুবদের বিবেকের তন্ত্রীতে আলোড়ন তোলে। সরকার কিছু না করলেও সারা ভারত জুড়ে ভগৎ সিং স্মরণে সাধারণ মানুষ ও ছাত্র-যুবদের উদ্যোগে অসংখ্য অনুষ্ঠান এবং তাঁর জীবন নিয়ে চর্চার প্রতি তাদের আগ্রহ তারই প্রমাণ দেয়। এমনকী ২৩ মার্চ পাকিস্তানের লাহোর সহ নানা জায়গায় ভগৎ সিং স্মরণ অনুষ্ঠান হয়েছে। সে দেশে দাবি উঠেছে ভগৎ সিং এবং তাঁর সঙ্গীদের ফাঁসির জন্য ব্রিটেনের রানি এলিজাবেথকে ক্ষমা চাইতে হবে।

গান্ধীজির বিশ্বস্ত অনুগামী তথা কংগ্রেসের ইতিহাসবিদ পট্টভি সীতারামাইয়া পর্যন্ত বলেছিলেন, সারা দেশে ভগৎ সিং-এর জনপ্রিয়তা গান্ধীজির থেকে কিছু কম ছিল না। কিন্তু ভগৎ সিংকে যেমন করে চিনেছিলেন সুভাষচন্দ্র সহ আপসহীন বিপ্লবীরা, গান্ধীবাদীরা তাঁকে দেখেছিলেন ঠিক বিপরীত দৃষ্টিতে। সুভাষচন্দ্র বলছেন, 'ভগৎ সিং হলেন বিপ্লবের মূর্ত প্রতীক', সারা দেশ জুড়ে ভগৎ সিং-এর প্রতি আবেগ দেখে তাঁর অভিমত, 'এই আবেগ বিপ্লবের যে অগ্নিশিখাকে জ্বালিয়ে দিয়েছে তা অনির্বাণ থাকবে'। অথচ গান্ধীজির অভিমত ছিল, 'ভগৎ সিং পূজা' দেশের অপূরণীয় ক্ষতি করেছে এবং করে চলেছে। এই উন্মাদনার ফল হচ্ছে 'গুণ্ডামি আর অধঃপতন'। হিন্দুত্ববাদের ধ্বজাধারী আরএসএস-এর গুরু গোলওয়ালকর ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামকে 'প্রতিক্রিয়াশীল' বলেছিলেন। অর্থাৎ তাদের মতে, ভগৎ সিং সহ সমস্ত বিপ্লবী এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীরা ছিলেন প্রতিক্রিয়াশীল। সবচেয়ে দুঃখের হল সে সময় যাঁরা নিজেদের কমিউনিস্ট বলত সেই সিপিআই পর্যন্ত ভগৎ সিং-কে সন্ত্রাসবাদী মনে করত। তাদের নেতা মুজফফর আহমেদ কানপুর ষড়যন্ত্র মামলায় আদালতে দেওয়া জবানবন্দীতে ভগৎ সিং-এর আগের সমস্ত বিপ্লবীকে 'হিন্দু সাম্প্রদায়িক', এবং ভগৎ সিং ও তাঁর সংগঠন হিন্দুস্তান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনকে সন্ত্রাসবাদী ও বিপ্লব বিরোধী বলেছিলেন। (গণশক্তি, মুজফফর আহমেদ শতবর্ষ, বিশেষ সংখ্যা, ১৯৮৯)

কেন ভগৎ সিং-এর এত বিরোধিতা! ভগৎ সিং ১৯৩১ সালে ফাঁসির তিনদিন আগে গভর্নরের উদ্দেশে প্রেরিত পিটিশনে লিখেছিলেন, '... যুদ্ধ শুরু হয়েছে এবং যতদিন ভারতীয় জনগণ এবং শ্রমিকদের জীবন-জীবিকার উপায়গুলির ওপর ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের একাধিপত্য কায়েম থাকবে ততদিন পর্যন্ত এই যুদ্ধ চলবে, তা সেই ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ইংরেজ পুঁজিপতি, ইংরেজ শাসকই হোন অথবা পুরোপুরি ভারতীয়ই হোন। যদি বিশুদ্ধ ভারতীয় পুঁজিপতিদের দ্বারাই কেবল গরিবের রক্ত শোষণ চলতে থাকে, তবুও পরিস্থিতির খুব বেশি পরিবর্তন হবে না।' ভগৎ সিং চেয়েছিলেন শুধু ব্রিটিশকে তাড়ানো নয়, শোষণমুক্তির সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামকে চালিত করতে। যা পুঁজিপতি শ্রেণি এবং তাদের প্রতিভূদের শঙ্কিত করেছিল।

এ দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লবী ধারার মধ্যে ভগৎ সিং প্রথম বিজ্ঞানসম্মত চিন্তার ভিত্তিতে ধর্ম, ঈশ্বর ইত্যাদি অধ্যাত্মিকতার প্রভাব থেকে বিপ্লবী আন্দোলনকে মুক্ত করার সংগ্রাম করেছিলেন। এই কাজে তাঁর হাতিয়ার ছিল মার্কসবাদ-লেনিনবাদ। ভগৎ সিং স্বাধীনতা আন্দোলনে যথার্থ ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে ছিলেন, কংগ্রেসের মঞ্চে সর্বধর্ম সমন্বয়ের নামে ধর্ম শাস্ত্র পাঠ করার বিরোধিতা করে তিনি বলছেন এর ফলে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রভূত ক্ষতি হয়েছে। 'ধর্ম পাহাড় প্রমাণ বাধা স্বরূপ' প্রবন্ধে তিনি লিখছেন, 'ধরা যাক ভারতে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়েছে। সামনে বন্দুক নিয়ে শত্রু সৈন্য, আমাদের গুলি চালানোর সময় উপস্থিত। এমন সময় সেই মহম্মদ ঘোরীর কীর্তির মতো যদি শত্রুরা গরু, শুয়োর কিংবা বেদ কোরান গ্রন্থসাহিব সাজিয়ে আড়াল তোলে আমরা কী করব? খাঁটি ধার্মিক হলে তো আমাদের পোঁটলা পুঁটলি বেঁধে ঘরে ফিরে আসতে হবে।...তাহলে আমাদের করণীয় কী? আমাদের করণীয় হল ধর্মের বিরুদ্ধে যাওয়া।' জোড়াতালি দিয়ে কিছু বড় বড় কথা বলে তৎকালীন কংগ্রেস নেতারা যে সম্প্রদায়গত ঐক্যের কথা বলতেন তার অসারতা দেখিয়ে ভগৎ সিং লিখছেন, 'একদিকে ঐক্য নিয়ে আলোচনা চলছে, আর অন্যদিকে আর্যসমাজী এবং মুসলমানদের মধ্যে লাঠালাঠি হচ্ছে। কারণ উভয় পক্ষই নিজেদের চেতনা, বুদ্ধি এবং বিবেচনার দরজা তালাবন্ধ করে এসেছে।'(ঐ) ধর্মভিত্তিক পৃথক পৃথক সংগঠনের অশুভ পরিণামের বিষয়ে সে সময়েই হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন তিনি। এই ভগৎ সিং-কে হিন্দু সাম্প্রদায়িক আরএসএস অনুগামী বিজেপি সরকার, যে ভুলে থাকতে চাইবে তা বলাই বাহুল্য।

ব্রিটিশের বদলে ভারতীয় পুঁজিপতিদের শাসন যে দেশের মানুষকে কিছুই দেবে না তা নির্দিষ্ট করে দেখিয়ে তিনি বলছেন, 'ভারত সরকারের সর্বোচ্চ গদিতে লর্ড রেডিং-ই থাকুন আর পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরদাসই থাকুন, লর্ড আরউইনের পরিবর্তে স্যার তেজবাহাদুর সপ্রুই আসুন, তাতে দেশের শ্রমিক কৃষকের জীবনে কী পরিবর্তন আসবে!' তিনি আরও বলছেন, শ্রমিক কৃষককে বিপ্লবে নিয়ে আসতে হবে, তাদের স্বার্থে বিপ্লব পরিচালনা করতে হবে, কারণ—'এ বিপ্লব সর্বহারার স্বার্থে সর্বহারাদের নিজস্ব বিপ্লব'। (তরুণ রাজনৈতিক কর্মীদের প্রতি) ভগৎ সিং-আরও বলছেন, 'রাজনৈতিক বিপ্লব মানে শুধুমাত্র ব্রিটিশের হাত থেকে ভারতীয়দের হাতে রাষ্ট্র (অর্থাৎ ক্ষমতা) হস্তান্তর করা বোঝায় না।...জনগণের সমর্থনের ভিত্তিতে বিপ্লবী দলের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা আসা চাই। তারপর সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে গোটা সমাজকে পুনর্গঠিত করার পথে সংগঠিতভাবে আমাদের এগোতে হবে।'(ঐ) এই কাজে ভগৎ সিং ভেবেছিলেন একদল 'জাত বিপ্লবী' যারা বিপ্লব ছাড়া আর কোনও কিছু নিয়ে ভাববে না, তেমন বিপ্লবী কর্মী গড়ে তোলার কথা। সে সময় সিপিআই নেতৃত্ব এ কথা তো ভাবেনইনি এমনকী ভগৎ সিং-কে তাঁরা 'সন্ত্রাসবাদী' বলে অভিহিত করে দিলেন! কংগ্রেস-বিজেপি-র মতোই আজ কমিউনিস্ট নামধারী সিপিআই-সিপিএমও তাই ভগৎ সিং-এর এই সংগ্রামী স্মৃতিকে তুলে ধরতে চায় না। কিছু আবেগমথিত শূন্যগর্ভ ভাষণে তারা দেশের মানুষের চোখে ধুলো দিতে চায়।

এতদসত্ত্বেও তীব্র সংকটে জর্জরিত মানুষ লড়াইয়ের পথ খুঁজতে খুঁজতে আবার মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সর্বোন্নত উপলব্ধির সন্ধান করছে। তারা নতুন করে চিনছে ভগৎ সিং-কে। তাঁর জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে আরও এগিয়ে যাওয়ার পথে পা বাড়াচ্ছে। ভগৎ সিং-এর উত্তরাধিকারকে ভুলিয়ে দেওয়া যাবে না।

# বামফ্রন্টের অবাম শাসন দক্ষিণপন্থীদের মাথা তোলার জমি তৈরি করেছে

২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বামপন্থীদের অন্যতম ঘাঁটি যাদবপুর কেন্দ্রে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তাঁর এক অধস্তন আমলার কাছে ১৬ হাজার ভোটে পরাজিত হন। যাদবপুরের মতো সিপিএমের বরাবরের জেতা 'নিশ্চিত আসন'-এ সিপিএমের অনুরাগীরাই বিরূপ না হলে এই ফলাফল যে হত না, এই সত্য বোঝার জন্য বেশি বুদ্ধিমান বা ভোটবিশারদ হওয়ার দরকার হয় না। অথচ সরকারি ক্ষমতা হারাবার পর সিপিএম নেতাদের ভাবে-ভঙ্গিতে কথা-বার্তায় এই বোধোদয়ের সামান্য লক্ষণও দেখা গেল না। সারা রাজ্যে সিপিএমের নিচুতলার সৎ রাজনৈতিক কর্মীরা কিন্তু অনেকেই বলেন, আমরা 'সরকারে থাকতে' যা যা করেছি, তৃণমূল আজ ক্ষমতা ধরে রাখার ও বাড়াবার জন্য সেগুলোই করছে। সিপিএম কর্মীদের এই সহজ স্বীকারোক্তিই বলে দেয়, ৩৪ বছর একটানা সরকারে সিপিএম ফ্রন্ট থাকার পরও কেন এ রাজ্যে দক্ষিণপন্থী তৃণমূল শক্তি সঞ্চয় করতে পারল।

২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন হয়েছিল একটি মানদণ্ডে। কারা সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের প্রতিরোধ আন্দোলনের পক্ষে, আর কারা সরকারি অত্যাচার, গণহত্যা ও ক্রিমিনালদের দিয়ে গণধর্ষণের পক্ষে। এই প্রশ্নে পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ মানুষই চেয়েছিলেন অত্যাচারী সিপিএম সরকারের অপসারণ। এরই সুবাদে তৃণমূল কংগ্রেস জিতে যায়।

২০০১ সালে কংগ্রেসের সাথে জোট করে তৃণমূল লড়েছিল। জিততে পারেনি। ২০০৬ সালে 'হয় এবার নয় নেভার' স্লোগান তুলে বিজেপির সাথে জোট করেছিল তারা। সেবারেও জিততে পারেনি। ২০০৬-২০০৭ সালে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনের পর ২০০৮-এর পঞ্চায়েত নির্বাচন, ২০০৯-এর লোকসভা নির্বাচনে জনমত সিপিএমের বিরুদ্ধে যায়, সর্বশেষ ২০১১-র বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্টের ভরাডুবি হয়। এই ইতিহাস কি প্রমাণ করে না যে, বামফ্রন্টের অত্যাচারী শাসনই দক্ষিণপন্থী তৃণমূলের শক্তির উত্থানের জমি তৈরি করেছিল এই রাজ্যে?

*বামফ্রন্টের জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে রাজপথে বারবার আছড়ে পড়েছে গণআন্দোলনের ঢেউ*

শিল্পায়নের নামে জোর করে কৃষকের জমি অধিগ্রহণ করতে গিয়ে সিঙ্গুরে রাজকুমার ভুল নামে এক প্রতিবাদী যুবককে পিটিয়ে হত্যা করা, তাপসী মালিক নামে এক প্রতিবাদী কিশোরীকে পুড়িয়ে মারা, বহু গ্রামবাসীকে কারারুদ্ধ করা, নন্দীগ্রামে ১৪ জন আন্দোলনকারীকে গুলি করে হত্যা করা, শত শত কৃষককে লাঠিগুলিতে পঙ্গু করা, নেতাইয়ে গণহত্যার মতো অসংখ্য ঘটনা রাজ্যবাসীকে বামফ্রন্ট সম্পর্কে চূড়ান্ত বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছিল। 'আমরা ২৩৫, ওরা ৩০'— এই ঔদ্ধত্য, 'টাটার কেশাগ্র স্পর্শ করতে দেব না' —হুঙ্কার, 'নন্দীগ্রামকে চারদিক থেকে ঘিরে লাইফ হেল করে দেওয়ার' হুমকি ইত্যাদি চোখরাঙানি ভাষা রাজ্যের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ মেনে নিতে পারেননি। সিপিএম-এর এই আচরণ কি বামপন্থীসুলভ ছিল? কেন তাদের এই 'ভুল' বা 'বাড়াবাড়ি' ঘটল তা কি তারা জনগণের সামনে বলেছে? ক্ষমা চেয়েছে? ভবিষ্যতে কোনও দিন করবে না প্রতিশ্রুতি দিয়েছে? দেয়নি। তা হলে মানুষ তাদের বিশ্বাস করবে কীসের ভিত্তিতে?

বামপন্থার সঙ্গে দক্ষিণপন্থার মৌলিক পার্থক্য আছে। বামফ্রন্টের ৩৪ বছরের শাসন কি দক্ষিণপন্থী বুর্জোয়া দলগুলির শাসনের সঙ্গে সুনির্দিষ্ট পার্থক্য দাঁড় করাতে পেরেছে? বুর্জোয়া ব্যবস্থায় সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার মধ্যে একটা বামপন্থী দলের সরকার পরিচালনার দৃষ্টিভঙ্গি কী হওয়া উচিত? ১৯৬৭ সালের যুক্তফ্রন্টের সময় থেকেই এস ইউ সি আই (সি) বলে আসছে — পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় কোনও অঙ্গ রাজ্যে বামপন্থীরা সরকার গঠন করলে সেই বামপন্থী সরকার ১) আইনশৃঙ্খলার নামে শ্রমিক কৃষক ও মধ্যবিত্ত জনগণের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনকে পুলিশ দিয়ে দমন করবে না বরং তাকে উৎসাহিত করবে, ২) আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা খর্ব করে সংগঠিত জনগণের উপর নির্ভর করে সরকার চালাবে, ৩) প্রশাসনকে নিরপেক্ষ দুর্নীতিমুক্ত রাখবে এবং সরকারি অর্থ জনকল্যাণমূলক খাতে এবং সবচেয়ে দরিদ্র মানুষের স্বার্থে কাজে লাগাবে।

বামফ্রন্টের ৩৪ বছরের শাসন কি এই দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিচালিত হয়েছে? নাকি উল্টোটা ঘটেছে? ক্ষমতায় বসার দু'বছরের মধ্যে ১৯৭৯ সালে বামফ্রন্ট মরিচঝাঁপি দ্বীপের সহায় সম্বল হারা উদ্বাস্তুদের উপর যেভাবে পৈশাচিক অত্যাচার করে, তাদের ঝুপড়িগুলি জ্বালিয়ে দিয়ে, লাঠিগুলি চালিয়ে হত্যা করে সাগরে বা বাঘের মুখে মৃতদেহগুলি ফেলে দিয়েছিল— সেটা কি বামপন্থা ছিল? ক্ষমতায় এসে হঠাৎ কী প্রয়োজনে লাঠিগুলি চালিয়ে তাদের উচ্ছেদ করতে হল আজও তার উত্তর সিপিএম জনগণের কাছে দিয়েছে কি? এই নৃশংস আক্রমণের জন্য ক্ষমা চেয়েছে কি?

১৯৯০ সালে ৩০ মে বানতলায় সিপিএম পার্টি অফিসের সামনে আক্রান্ত হন ইউনিসেফের এক অফিসার রেণু ঘোষ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের পরিবার কল্যাণ শাখার কর্মী অনীতা দেওয়ান ও উমা ঘোষ। সরকারি গাড়ি করে তাঁরা যখন যাচ্ছিলেন, সেই সময় সিপিএম সমর্থক বলে পরিচিত একদল যুবক পার্টি অফিসের সামনে সন্ধ্যা সাড়ে ছটা নাগাদ তাঁদের গাড়ি আটকায়। ওই তিন মহিলাকে প্রায় আধ কিলোমিটার রাস্তা টেনে নিয়ে যাওয়া হয় একটা মাঠে। রাত সাড়ে এগারোটায় ওই তিন মহিলার বিবস্ত্র ক্ষতবিক্ষত দেহ ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে নিয়ে আসা হয়। ডাক্তাররা অনীতা দেওয়ানকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ওই পৈশাচিক বীভৎস ঘটনা সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু সাংবাদিকদের বললেন, 'এরকম তো কতই হয়, সমাজবিরোধী কাজ, ডাকাতি, মারধর। এতে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার অবনতি হয়েছে বলতে হবে কেন?' মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্য কি বামপন্থী রুচি-সংস্কৃতির সঙ্গে আদৌ মেলে? এই ঘটনা কি বামপন্থার মর্যাদায় আঘাত হানে না?

১৯৯০ সালের ৩১ আগস্ট খাদ্য আন্দোলনের শহিদ দিবসে মূল্যবৃদ্ধি, বাসের ভাড়াবৃদ্ধির বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ আইন অমান্য আন্দোলনের ডাক দিয়েছিল এস ইউ সি আই (সি)। সেই মিছিলে বামফ্রন্ট সরকারের পুলিশের গুলিতে ঘটনাস্থলে মারা যায় দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার রাধাকান্তপুরের খেতমজুর পরিবারের সন্তান ১৮ বছরের যুবক মাধাই হালদার। ওই দিন এসপ্ল্যানেডে শহিদ স্মরণে সভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। তিনি বললেন, 'নিরামিষ আন্দোলন আমিষ' করা হল। এই উক্তি কি বামপন্থী ঐতিহ্যের সঙ্গে মেলে?

সিপিএম ক্ষমতায় আসার দু'বছরের মধ্যেই ইংরেজি এবং পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এই সিদ্ধান্তটিও শ্রমিক-কৃষকের স্বার্থে ছিল না। তা হলে কাদের স্বার্থে তুলে দিয়েছিল? ইংরেজি ও পাশ-ফেল প্রথা তুলে দিলে সরকারি স্কুলের প্রতি মানুষ আগ্রহ হারাবে, বেসরকারি শিক্ষা ব্যবসার বাজার তৈরি হবে, শিক্ষা ব্যবসায়ীরা স্কুল কলেজ খুলে ব্যবসা করবে, মুনাফা করবে— তাদের স্বার্থেই সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এর ফল কী দাঁড়িয়েছে? গরিব, নিম্নবিত্ত, এমনকী মধ্যবিত্তেরও একটা বিরাট অংশকে শিক্ষার বিপুল ব্যয়ভার বহন করতে গিয়ে হিমসিম খেতে হচ্ছে। বিপুল ব্যয়ভার টানতে না পেরে অনেকেই ড্রপ আউট হয়ে যাচ্ছে। বামপন্থার পরিপূরক শাসন পরিচালনা করলে সরকার শিক্ষার ক্ষেত্রে এমন নীতি গ্রহণ করত যাতে শিক্ষার বেসরকারিকরণ বাণিজ্যিকীকরণ না হয়, মানুষ আর্থিক 'কারণে' শিক্ষার জগৎ থেকে নির্বাসিত না হয়।

সিপিএম শাসন বামপন্থার অনুসারী ছিল না বলেই, আশির দশকে হাসপাতালে ৮০টি ওষুধ ছাঁটাই করেছিল, বিভিন্ন পরিষেবার উপর চার্জ বসিয়েছিল। সিপিএম কর্মী-সমর্থকরা ভেবে দেখুন বামপন্থী নীতিতে শাসন পরিচালনা করলে সিপিএম কি বিদ্যুতে ভরতুকি তুলে দিতে পারত? পশ্চিমবঙ্গে একসময় বিদ্যুতে ৫০০ কোটি টাকা ভরতুকি দেওয়া হত। তার মধ্যে ৩৯০ কোটি টাকা ভরতুকি বাতিল করেছিল সিপিএম সরকার। বাকি ১১০ কোটি টাকা তুলে দিয়েছে তৃণমূল সরকার। মাসে মাসে বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর এম ভি সি এ আইন তো সিপিএমই তৈরি করেছে। এসবই তো বিদ্যুতের দাম ঊর্ধ্বমুখী করেছে। এগুলি কি অন্যান্য রাজ্যের বুর্জোয়া সরকারের মতোই কাজ নয়?

চা শিল্পে, চটকলে বহু কর্মচারী স্বার্থবিরোধী কালাচুক্তি ৩৪ বছরের শাসনে হয়েছে। এসব ক্ষেত্রেও সরকার মালিকের পক্ষে দাঁড়িয়েছে। চটকলে সম্পাদিত বেতন কাটার চুক্তি, চা-শিল্পে সপ্তাহে তিন দিনের বেতনে ছয় দিন কাজ করানোর কালা চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। সিপিএম দল এবং সরকার শ্রমিকদের এসব মানতে বাধ্য করার চেষ্টা করেছে। আন্দোলন করলে মালিক কারখানা গুটিয়ে নেবে, তাতে শ্রমিকদেরই ক্ষতি — এই সব আপসমুখী যুক্তি করে শ্রমিক আন্দোলন নিস্তেজ করেছে। এর ফলে মালিকী শোষণ বেড়েছে। এগুলি কোনওটাই বামপন্থার সঙ্গে মেলে না।

তোলাবাজি, দুর্নীতি, ঘুষ, দলবাজি, বিরোধীদের ওপর রাজনৈতিক আক্রমণ বা সন্ত্রাস ইত্যাদি যে সমস্ত অপকর্মে আজ তৃণমূল অভিযুক্ত সবই সিপিএম শাসনে একটা উচ্চ মাত্রায় পৌঁছেছিল। ভারতের শোষক বুর্জোয়া শ্রেণি, সিপিএম সরকারকে দু'ভাবে ব্যবহার করেছিল। প্রথমত, বামপন্থার স্লোগান দিয়ে শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-যুব আন্দোলনকে ভিতর থেকে মেরে দিয়ে ওই সরকারকে দিয়ে বুর্জোয়াদের স্বার্থ রক্ষার যাবতীয় কাজ করিয়ে নিচ্ছিল। দ্বিতীয়ত, তারাই আবার সিপিএম সরকারের কুকর্মগুলি দেখিয়ে বলছিল, এই হচ্ছে মার্কসবাদ, এটাই হচ্ছে বামপন্থা, ফলে সাবধান! যার কবল থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষাই ২০১১ সালে 'পরিবর্তন চাই', 'বদল চাই' স্লোগানে পরিণত হয়েছিল। সেদিন দলে দলে বামপন্থী ভোটাররা 'পরিবর্তনে'র পক্ষে ভোট না দিলে, পালাবদল ঘটত না।

ফলে ৩৪ বছরের শাসন এক কথায় ছিল জনবিরোধী এবং অ-বামসুলভ। একইভাবে বর্তমানে বামফ্রন্টের ভূমিকাও বামপন্থার মর্যাদাকে আহত করেছে। নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বিজেপি সরকারের প্রবল অর্থনৈতিক আক্রমণ, সাম্প্রদায়িকতা ও ফ্যাসিস্ট নীতির বিরুদ্ধে এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সর্বভারতীয় স্তরে ছয় বামদলের যে ঐক্য হয়েছে তার প্রেক্ষিতে যখন প্রয়োজন ছিল এই বাম ঐক্য শক্তিশালী করার এবং তা শক্তিশালী হতে পারে কেবলমাত্র গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে — তখন দেখা গেল নিছক ক্ষমতার স্বার্থে কিছু বিধায়ক বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিপিএম তার পুরনো শরিকদের সাথে নিয়ে কংগ্রেসের মতো একটা চূড়ান্ত দক্ষিণপন্থী বুর্জোয়া দলের সঙ্গে নির্বাচনী সমঝোতা করল। এই ঘটনাও বামপন্থী মানুষদের আহত করেছে।

আরও আহত করেছে কংগ্রেস দলকে গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ রূপে মূল্যায়ন করা। যে কংগ্রেস এসমা, নাসা, মিসা, টাডা, আফস্পা, ইউ এ পি এ ইত্যাদি অসংখ্য কালা আইন জারি করে গণতন্ত্রকে হত্যা করেছে, জরুরি অবস্থা জারি করে দেশটাকে ২১ মাসের জন্য কারাগার বানিয়ে দিয়েছিল, ১৯৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলনে লাঠিগুলি চালিয়ে ৮০ জনকে হত্যা করেছে, শ্রমিক চাষির আন্দোলনকে নির্মমভাবে দমন করেছে— ভোটের স্বার্থে সেই কংগ্রেসকে 'গণতান্ত্রিক' আখ্যা দেওয়া কোনও বামপন্থী মানুষ মেনে নিতে পারেন? একইভাবে যে কংগ্রেস শাসনে অসংখ্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে, যে কংগ্রেসের ধর্মভিত্তিক রাজনীতি বিজেপি-আর এস এসকে মাথা তুলতে, শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে সেই কংগ্রেসের সাথে জোট করার জন্য সিপিএম নেতৃত্ব কংগ্রেসকে ধর্মনিরপেক্ষ, সেকুলার বলে সার্টিফিকেট দিচ্ছে। ক্ষমতার লোভ মাত্রা না ছাড়ালে কোনও সত্যিকারের বামপন্থী চেতনার মানুষ এইসব আদর্শগত গোঁজামিল সমর্থন করতে পারেন না।

দেশের জনগণের সামনে একটা মারাত্মক বিপদ দেখা দিলে তার বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রয়োজনে কখনও কখনও বামপন্থীরা দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে ঐক্যে যায়। সিপিএম কি জনস্বার্থে আন্দোলনের প্রশ্নে কংগ্রেসের সঙ্গে ঐক্য করেছে? আদৌ তা নয়। এই ঐক্যের মূলে রয়েছে শুধু ভোট, গদি, মন্ত্রীত্ব। সেই কারণেই সিপিএমের এই অবস্থান বামপন্থী মানুষদের ব্যথা দিয়েছে। এই অবস্থায় বামপন্থার মর্যাদা রক্ষার্থে সংগ্রামী বামপন্থী দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) পৃথকভাবে নির্বাচনী সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে।

# কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের গত ২ বছরের জনবিরোধী কাজের খতিয়ান

**সংসদকে এড়িয়ে একের পর এক অর্ডিন্যান্স জারি**

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শপথ নেওয়ার আগে বলেছিলেন, তাঁর কাছে সংসদ বা পার্লামেন্ট হচ্ছে গণতন্ত্রের পবিত্র মন্দির, যার সামনে মাথা নত করতে হয়। কিন্তু ক্ষমতায় বসে 'পবিত্র মন্দির'কে সযত্নে এড়িয়ে মাত্র সাত মাসের মধ্যেই আটটি কালা অর্ডিন্যান্স জারি করেছেন। সংসদকে এড়িয়ে এভাবে অর্ডিন্যান্স বা প্রশাসনিক হুকুম জারি করা গণতন্ত্রের পরিপন্থী। অর্ডিন্যান্সগুলির চরিত্রও অগণতান্ত্রিক এবং চূড়ান্ত জনবিরোধী।

**রেলের বিপুল ভাড়া বৃদ্ধি**

ক্ষমতায় বসার ৬ মাসের মধ্যেই মোদি সরকার যাত্রী ভাড়া ১৪.২ শতাংশ বাড়িয়েছে, পণ্য মাশুল বাড়িয়েছে ৬.৫ শতাংশ। ডিজেলের দাম কমায় রেলেও ভাড়া কমানো যখন ছিল যুক্তিসঙ্গত তখন মোদি সরকার কমানোর পরিবর্তে ভাড়া বাড়াল। দ্বিতীয়ত, তৎকাল টিকিটের ৫০ শতাংশের দাম ইচ্ছামতো বাড়ানোর নিয়ম করেছে ডায়নামিক প্রাইসিং-এর নামে। তৃতীয়ত, টিকিট ক্যানসেলেশন চার্জ দ্বিগুণ করে দিয়েছে। প্ল্যাটফর্ম টিকিটের দাম ৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০ টাকা করেছে। মেট্রো রেলের ভাড়া ২০০ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। মেট্রোর ন্যূনতম ভাড়া ৫ টাকার পরিবর্তে ১০ টাকা করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

**ওষুধের দাম বাড়ানোর অধিকার মালিকদের দিয়েছে**

মোদি সরকার ক্ষমতায় এসেই প্রথম ধাপে ১০৮টি ওষুধের উপর থেকে সরকারি নিয়ন্ত্রণ তুলে দেয়। এর ফলে কোম্পানিগুলি ওষুধের দাম খুশি মতো বাড়ানোর সুযোগ পেয়ে যায়। জলাতঙ্কের যে ইঞ্জেকশনের দাম ছিল ২,৫০০ টাকা, তার দাম বেড়ে হয় ৭,৫০০ টাকা। ক্যান্সারের একটি ওষুধের দাম ছিল ৮,৫০০ টাকা, তার দাম বেড়ে হয় ১ লক্ষ টাকার বেশি। দ্বিতীয় ধাপে সরকার ৫০৯টি অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের দাম বাড়ানোর অনুমতি দেয়। বিভিন্ন অ্যান্টিবায়োটিক, ডায়াবেটিস, হেপাটাইসিস - বি,সি ইত্যাদির ওষুধের দাম ব্যাপক বেড়ে যায়। আক্রমণ এখানেই শেষ নয়, স্বাস্থ্য বাজেটে বরাদ্দ ২০ শতাংশ কমিয়ে দেয় মোদি সরকার। হাসপাতালে যে ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে না, তার রহস্য এখানেই। বিজেপি যে খসড়া স্বাস্থ্যনীতি ২০১৫ তৈরি করেছে, তাতে স্বাস্থ্য মানুষের অধিকার নয়, বাজারের পণ্য, টাকার বিনিময়ে কিনতে হবে। স্বাস্থ্যকে করে দেওয়া হচ্ছে বিমা নির্ভর। এই বিমার টাকা রোগীকেই দিতে হবে। সরকার কোনও দায় নেবে না।

**পরিষেবা কর বৃদ্ধি**

১ জুন ২০১৫ যাবতীয় পরিষেবার উপর ১৪ শতাংশ হারে সার্ভিস ট্যাক্স বসিয়েছে মোদি সরকার। এর ফলে মোবাইলে কথা বলার খরচ, হোটেল খরচ, বিনোদন খরচ ইত্যাদি অনেক বেড়ে গেছে। মোদি সরকার বাড়িয়েছে ২ শতাংশ হারে 'স্বচ্ছ ভারত' কর। অন্যদিকে বাজেটে পুঁজিপতিদের কর ৩০ শতাংশ থেকে কমিয়ে করেছে ২৫ শতাংশ।

**বিজেপির বিদ্যুৎ নীতি মাশুল বৃদ্ধির সিংহদুয়ার খুলে দিয়েছে**

বিদ্যুতের দাম যে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে তার মূলে রয়েছে বিদ্যুৎ আইন ২০০৩। অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে বিজেপি সরকার এই আইন এনেছিল। মোদি সরকার বিদ্যুৎ বিল ২০১৪ এনে বিদ্যুৎ কোম্পানিগুলিকে আরও মুনাফা পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। এই বিলে এমনও বলা হয়েছে, কোম্পানি কোনও বছরের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি মাশুল বৃদ্ধির জন্য আবেদন না করে তা হলে বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন নিজেই মাশুল বাড়িয়ে দেবে।

**শ্রম আইন সংস্কার করে শ্রমিকদের দাস বানাতে চায় বিজেপি সরকার**

ক) শিল্প বিরোধ আইন ১৯৪৭ অনুযায়ী, ১০০ শ্রমিক কাজ করেন এমন কারখানায় ছাঁটাই বা ক্লোজারের ক্ষেত্রে সরকারি অনুমোদন বাধ্যতামূলক। মোদি সরকার প্রস্তাব করেছে সর্বাধিক ২৯৯ জন শ্রমিক কাজ করেন এমন কারখানায় ছাঁটাইয়ের ক্ষেত্রে সরকারি অনুমোদন লাগবে না, মালিক চাইলেই ছাঁটাই করতে পারবে। ভারতে যত কারখানা তার ৯৫ শতাংশের ক্ষেত্রে শ্রমিক সংখ্যা ৩০০-র বেশি। ফলে প্রায় সব কারখানায় মালিক ইচ্ছামতো শ্রমিক ছাঁটাই করতে পারবে।

খ) বিদ্যুত চালিত কারখানায় ন্যূনতম ১০ জন শ্রমিক থাকলে এবং বিদ্যুতে চলে না এমন কারখানায় ন্যূনতম ২০ জন শ্রমিক থাকলে ফ্যাক্টরি আইন ১৯৪৮ প্রযোজ্য হত। মোদি সরকার প্রস্তাব করেছে বিদ্যুৎ চালিত কারখানায় ন্যূনতম ২০ জন শ্রমিক থাকলে এবং বিদ্যুৎ বিহীন কারখানায় ন্যূনতম ৪০ জন শ্রমিক থাকলে তবেই এই আইন প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ ৭১ শতাংশ শ্রমিক এই আইনের বাইরে চলে যাবে।

গ) স্মল ফ্যাক্টরিজ রেগুলেশন অ্যান্ড সার্ভিস কন্ডিশনস বিল এনে মোদি সরকার বলেছে সর্বাধিক ৪০ জন শ্রমিক কাজ করেন এমন কারখানার ১৪টি শ্রম আইন প্রযোজ্য হবে না।

ঘ) সরকার অ্যাপ্রেন্টিস (সংশোধনী) আইন ২০১৪ এনেছে যাতে শ্রমিকদের অধিকাংশকেই অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে অনন্তকাল রেখে দেওয়া যায়। এদের জন্য কোনও ন্যূনতম মজুরি থাকবে না। এরা মালিক নির্ধারিত মজুরির ৭০ শতাংশের বেশি পাবে না। এদের কর্মজীবন শেষ হবে অ্যাপ্রেনটিস হিসাবে। অবসরকালীন সুবিধা বা কোনও সামাজিক সুরক্ষার অধিকারী এরা হবে না।

ঙ) কন্ট্রাক্ট লেবার রেগুলেশন অ্যাক্ট অনুযায়ী এতদিন ২০ জন শ্রমিক থাকলেই ঠিকাদার এই আইনের আওতায় পড়ত। এখন তা বাড়িয়ে ৫০ জন করা হয়েছে। এই সংশোধনীর ফলে ঠিকাদারদের শ্রমিক শোষণের ক্ষমতা আরও বেড়ে গেল।

**চার হাজার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র বেদান্ত গোষ্ঠীর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে**

অঙ্গনওয়াড়ি প্রকল্প বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ার পথে অনেকটাই এগিয়েছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। ইতিমধ্যে বহুজাতিক সংস্থা বেদান্তর হাতে ভারতের প্রায় ৪০০০ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র তুলে দিয়েছে। এই প্রকল্পে বরাদ্দও কমাচ্ছে ব্যাপক হারে। ২০১৪-'১৫ সালে এই প্রকল্পে বরাদ্দ ছিল ১৮,১০৮ কোটি টাকা। ২০১৫-'১৬ সালে বরাদ্দ করা হয়েছে অর্ধেকেরও কম, মাত্র ৮,২২৫ কোটি টাকা। এই দুটো ঘটনা থেকেই পরিষ্কার, সরকার এই প্রকল্প আদৌ চালাতে চায় না। প্রকল্প পুরোপুরি বেসরকারি হাতে ছেড়ে দেওয়ার যে ব্লু-প্রিন্ট ২০১৩ সালে পূর্বতন কংগ্রেস সরকার করেছিল, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাকেই কার্যকর করেছেন। সরকারের এই ষড়যন্ত্র রুখতে না পারলে দেশের ২৮ লক্ষ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা কাজ হারাবেন, প্রায় ১০ কোটি গর্ভবতী প্রসূতি মহিলা পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হবেন, সদ্যোজাত সন্তান থেকে ৬ বছর বয়সি শিশুরা পুষ্টিকর খাদ্য থেকে বঞ্চিত হবে।

**চটশিল্প ও পাটচাষকে ধ্বংস করার চক্রান্ত**

শিল্পপতি আম্বানির রিলায়েন্স গোষ্ঠীর সিন্থেটিক বস্তার বাজার পাইয়ে দিতে চটশিল্পকে ধ্বংস করতে চলেছে মোদি সরকার। সরকার ঘোষণা করেছে খাদ্যদ্রব্যের প্যাকেজিং-এ চটের বস্তার ব্যবহার বন্ধ করে সিন্থেটিক বস্তা ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে হবে। এর ফলে বাজার না পেয়ে বিপন্ন হবে বাংলার ঐতিহ্যবাহী চটশিল্প। কাজ হারাবে আড়াই লক্ষ চটকল শ্রমিক। ক্ষতিগ্রস্ত হবে ৪০ লক্ষ চাষি পরিবার।

**প্রথম কৃষি বাজেটে বরাদ্দ ব্যাপক কমানো হয়েছে**

২০১৫ সালে মোদি সরকারের কৃষি বাজেটে ৩,২৭২ কোটি টাকা কমানো হয়েছে। আগের বছর বরাদ্দ ছিল ৩১,৩২২ কোটি টাকা, কমিয়ে করা হয়েছে ২৮,০৫০ কোটি টাকা। শস্য উৎপাদনে বরাদ্দ ৪১,৬৮১ কোটি টাকা থেকে কমিয়ে করা হয়েছে ৩৯,৮৬৮ কোটি টাকা। পশুপালনে বরাদ্দ ৫৯৯ কোটি টাকা থেকে কমিয়ে করা হয়েছে ৩৩০ কোটি টাকা। বৃহৎ ও মাঝারি সেচ প্রকল্পে বরাদ্দ ১,১২১ কোটি টাকা থেকে কমিয়ে করা হয়েছে ৫৭২ কোটি টাকা। ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পে বরাদ্দ ৪৬৮ কোটি টাকা থেকে কমিয়ে করা হয়েছে ৩০৬ কোটি টাকা। কৃষি বা কৃষকের সমস্যাকে মোদি সরকার কোনও গুরুত্বই দেয়নি। ফসলের ন্যায্য দাম না পেয়ে, ঋণের জালে জড়িয়ে, পুঁজিবাদী শোষণে সর্বস্বান্ত হয়ে ২০০১ থেকে ২০১৪, এই ১৫ বছরে সারা দেশে ৩ লক্ষ চাষি আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে। মোদি সরকারের পদক্ষেপে তা আরও বাড়বে।

**কৃষকের জমি কেড়ে নেওয়ার কালা অর্ডিন্যান্স**

সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-কলিঙ্গনগর সহ সারা দেশে কৃষক আন্দোলনের চাপে ২০১৩ সালে ইউ পি এ সরকার 'ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন অ্যাক্ট ২০১৩' নামে আইন তৈরি করে। তাতে বলা হয়েছিল,

ক) সরকার জমি অধিগ্রহণ করলে তাতে ৭০ শতাংশ কৃষকের সম্মতি থাকতে হবে।

বেসরকারি সংস্থা অধিগ্রহণ করলে ৮০ শতাংশের সম্মতি লাগবে।

খ) ক্ষতিপূরণ শুধু কৃষকদের নয়, সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকেই দেওয়া হবে এবং তাদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন দেওয়া হবে।

গ) অধিগ্রহণের পর সেই জমি পাঁচ বছর ব্যবহার না করলে তা জমির মালিককে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

নরেন্দ্র মোদি সরকার এই আইনে পরিবর্তন ঘটিয়ে বলেছে—

ক) জমি অধিগ্রহণে কার কী ক্ষতি হল তা বিচার করে দেখা হবে না।

খ) কৃষকদের মত নেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই।

গ) ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে শুধু জমির মালিককে। অর্থাৎ ভাগচাষি বা খেতমজুররা কোনও ক্ষতিপূরণ পাবে না।

ঘ) জমি ব্যবহার না করে শিল্পপতিরা অনির্দিষ্টকাল ফেলে রাখতে পারবে।

এই অর্ডিন্যান্স কার্যকর হলে কৃষক জমি হারিয়ে ভিখারিতে পরিণত হবে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, শিল্প কি তবে আকাশে হবে? না, আকাশে করার দরকার নেই। সরকার এ পর্যন্ত ১ লক্ষ ১২ হাজার একর জমি সরাসরি দখল করে শিল্পপতিদের দিয়েছে। তার মধ্যে ৪২ হাজার একর জমি এখনও অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ক্যাগের রিপোর্ট বলছে, শুধুমাত্র ওড়িশাতেই অব্যবহৃত জমি পড়ে আছে ৫,৪৪৪ একর। (ডাউন টু আর্থ ঃ৩০.১২.২০১২)

**১০০ দিনের কর্মসংস্থান প্রকল্পের ব্যাপক সংকোচন**

সারা বছর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা এ দেশের কোনও সরকারই করেনি। বিক্ষোভ চাপা দিতে বছরে ১০০ দিনের কর্মসংস্থানের যে প্রকল্প সারা দেশে ইউ পি এ সরকার চালু করেছিল তাতে কোনও রাজ্যেই ২০,২৫,৩০ দিনের বেশি কাজ জুটতো না। মোদি সরকার এই প্রকল্প সঙ্কুচিত করে সারা দেশের পরিবর্তে মাত্র ২০০টি জেলার কিছু ব্লকের মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে চলেছে। এর ফলে লক্ষ লক্ষ গরিব মানুষ আরও কর্মহীন হবে।

## এজেন্টস ফোরামের পুরুলিয়া জেলা সম্মেলন

২০ মার্চ অল বেঙ্গল চিটফান্ড ডিপোজিটার্স অ্যান্ড এজেন্টস ফোরামের পুরুলিয়া জেলা সম্মেলন হয়। উপস্থিত ছিলেন অশোকতরু প্রধান, আজিজুল হক, শম্ভু মান্না, জেলা সভাপতি রঞ্জিত চ্যাটার্জি প্রমুখ। ৬০০ এজেন্ট ও আমানতকারী উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে ঝাড়খণ্ডের ৬টি জেলা এবং পুরুলিয়ার ১৯টি ব্লকের প্রতিনিধিরা সংহতি জানান।

R.N.I. No 5268 / 60
P.R. No. KOL RMS/138/2016-18



# বাঙ্গালোরে সেভ এডুকেশন কনভেনশন

*১৯ মার্চ অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শাসক দলের হস্তক্ষেপ ও দলীয় কর্তৃত্ব কায়েমের অপচেষ্টার প্রতিবাদে কর্ণাটকের বাঙ্গালোরে 'সেভ ইউনিভার্সিটি, সেভ ডেমোক্রেসি' শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন জে এস পাটিল (ছবিতে), আল্লামাপ্রভু বেত্তাদরু, শশী দেশপাণ্ডে সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনরা।*

# কংগ্রেসের কেলেঙ্কারির তালিকা

**প্রধানমন্ত্রী যখন জওহরলাল নেহেরু**

| কেলেঙ্কারির নাম | কত টাকার |
|---|---|
| মুন্দ্রা কেলেঙ্কারি | ৩ কোটি |
| খনি কেলেঙ্কারি | ২ কোটি |
| কায়রোঁ কেলেঙ্কারি | ১ কোটি |

**প্রধানমন্ত্রী যখন ইন্দিরা গান্ধী**

| | |
|---|---|
| নাগরওয়ালা কেলেঙ্কারি | ৬০ লক্ষ |
| জমি কেলেঙ্কারি (ভজনলাল) | ..... |
| তুলমোহন কেলেঙ্কারি | ..... |
| সোনা, হাতঘড়ি চোরাচালান কেলেঙ্কারি | ১৯ কোটি |
| ইন্দিরা প্রতিষ্ঠান কেলেঙ্কারি | .... |
| তৈলকূপ খনন কেলেঙ্কারি | ৭ লক্ষ ২৬ হাজার |

**প্রধানমন্ত্রী যখন রাজীব গান্ধী**

| | |
|---|---|
| জেলা কোঅপাঃ কেলেঙ্কারি (কানপুর) | ৪ কোটি |
| সমবায় ঋণ কেলেঙ্কারি (বিহার) | ৫৮৭ কোটি |
| বাজেট কেলেঙ্কারি ( উঃ প্রঃ) | ১০০০ কোটি |
| বোফর্স কেলেঙ্কারি | ৬৫ কোটি |
| ও এন জি সি অর্ডার কেলেঙ্কারি | ৩.৩৫ কোটি |
| ভুয়ো লটারি কেলেঙ্কারি (মঃ প্রঃ) | ..... |
| ৫৭৭ সরকারি প্লট কেলেঙ্কারি (মহাঃ) | ২০০০ কোটি |
| ডুবোজাহাজ কেলেঙ্কারি | ৩০ কোটি |
| চেক পিস্তল কেলেঙ্কারি | ..... |
| এয়ারবাস কেলেঙ্কারি | ২০০ কোটি |

**প্রধানমন্ত্রী যখন নরসিংহ রাও**

| | |
|---|---|
| শেয়ার কেলেঙ্কারি | ৫০৮৪ কোটি |
| ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক তছরুপ কেলেঙ্কারি | ৭৬৩ কোটি |
| ঠিকাদারি কেলেঙ্কারি | ৭ কোটি |
| এ বি ভি লোকো কেলেঙ্কারি | ১৯০ মিলিয়ন ডলার |
| চিনি কেলেঙ্কারি | ..... |
| পশুখাদ্য কেলেঙ্কারি (বিহার) | ৯৫০ কোটি |
| সুখরামের টেলিকম কেলেঙ্কারি | ১২০০ কোটি |

## আর্থিক কেলেঙ্কারি ও দুর্নীতিতে আপাদমস্তক নিমজ্জিত কংগ্রেস

● বোফর্স কেলেঙ্কারি — বোফর্স কামান কেনার জন্য প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর বিরুদ্ধে কোটি কোটি টাকা ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। এই কামানটি ছিল অত্যন্ত নিম্নমানের।

● কমনওয়েলথ গেমস কেলেঙ্কারি — ৮ হাজার কোটি টাকার এই তছরুপে কংগ্রেস সাংসদ সুরেশ কালমাদি সহ বিভিন্ন কংগ্রেসি সাংসদ জড়িত।

● টু-জি স্পেকট্রাম কেলেঙ্কারি — ১ লক্ষ ৭৬ হাজার কোটি টাকার টু-জি স্পেকট্রাম কেলেঙ্কারিতে কংগ্রেসি সাংসদরা জড়িত।

● আদর্শ আবাসন কেলেঙ্কারি — কার্গিল যুদ্ধে নিহত সৈনিকদের বিধবাদের জন্য মুম্বইয়ে যে আবাসনগুলি তৈরি হয়েছিল, মহারাষ্ট্রের কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্যরা তা অনৈতিকভাবে দখল করে নেয়।

● সংসদে ঘুষ কাণ্ড — নরসিমা রাও এবং মনমোহন সিংহ সরকার আস্থা ভোটে জেতার জন্য সাংসদ কেনার নোংরা খেলাতেও নেমেছিল।

*দক্ষিণ ২৪ পরগণার ডায়মন্ডহারবার বিধানসভা কেন্দ্রে এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থীর সমর্থনে দেওয়াল লিখন*

# শ্রমিকদের অধিকার কেড়ে নেওয়ার সরকারি মতলবের বিরুদ্ধে ফ্রান্সে বিক্ষোভ

প্যারিস আবার বিক্ষোভে উত্তাল। শ্রম আইন পরিবর্তনের সরকারি প্রস্তাব অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবিতে ৯ মার্চ ফ্রান্স জুড়ে পথে নেমেছিলেন পাঁচ লক্ষেরও বেশি মানুষ। এঁদের অধিকাংশই শ্রমিক। সংহতি জানাতে যোগ দিয়েছিলেন ছাত্ররা। এদিন ফ্রান্সের ২০০টিরও বেশি স্থানে সারাদিন ধরে চলেছে বিক্ষোভ প্রদর্শন। এ সংক্রান্ত বিল প্রত্যাহারের দাবিতে ইন্টারনেটে প্রচারিত স্মারকলিপিতে সই করেছেন ১০ লক্ষেরও বেশি মানুষ।

কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গত শতকে ফ্রান্সের শ্রমিকরা বেশ কিছু অধিকার অর্জন করেছিলেন। বর্তমান জাতীয় শ্রম আইন অনুযায়ী সে দেশের প্রায় সমস্ত শ্রমিক বছরে পাঁচ সপ্তাহের ছুটি ছাড়াও অতিরিক্ত দশ দিনের ছুটি, সপ্তাহে ৩৫ ঘন্টার বেশি কাজ করলে অতিরিক্ত মজুরি, স্বাস্থ্য বিমা, বেকার ভাতা, অবসর ভাতা এবং পরিবারে জন্ম বা মৃত্যু হলে কাজ থেকে প্রয়োজনীয় ছুটি ইত্যাদি সুবিধা পেয়ে থাকেন। এইসব অধিকার রক্ষিত হচ্ছে কি না, তা দেখা এবং লে-অফ ও ছাঁটাইয়ের ক্ষেত্রে নজরদারি চালানোর জন্য ফ্রান্সে রয়েছে বিশেষ শ্রম আদালত। এখানে অত্যন্ত দ্রুত অভিযোগগুলির নিষ্পত্তি করা হয়। সরকার যদি শ্রম আইন সংস্কারের মতলব হাসিল করতে পারে তাহলে এইসব অধিকারের অনেকগুলি থেকেই খেটে-খাওয়া মানুষ বঞ্চিত হবে। 'সমাজবাদী' নামধারী শাসক সোস্যালিস্ট পার্টি দেশের পুঁজিপতিদের স্বার্থে সেই অপচেষ্টা চালাচ্ছে। এর বিরুদ্ধেই আন্দোলনের পথ বেছে নিয়েছেন ফ্রান্সের মেহনতি মানুষ। সংহতি জানিয়েছেন অন্যান্যরাও।

বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন মূলত ফ্রান্সের ফোর্স অভরিয়ের (এফ ও) ও জেনারেল কনফেডারেশন অফ ওয়ার্কার্স (সি জি টি)-র মতো জঙ্গি শ্রমিক সংগঠনের সদস্যরা। এছাড়াও নিউ অ্যান্টি-ক্যাপিটালিস্ট পার্টি ও ফ্রেঞ্চ কমিউনিস্ট পার্টির মতো বামপন্থী দলগুলিও এদিন বিক্ষোভ দেখিয়েছে। বিক্ষোভকারীদের অধিকাংশই ছিলেন বয়সে তরুণ। সরকারে আসীন সোস্যালিস্ট পার্টির মদতে ফরাসি সাম্রাজ্যবাদ যেভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হাত ধরে মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকায় হানাদারি চালাচ্ছে, বিক্ষোভকারীরা তাকেও ধিক্কার দিয়েছেন। দূরপাল্লার রেলপথ ও আঞ্চলিক রেলপথের কর্মীরাও এ দিন কর্মী ছাঁটাইয়ের সরকারি অপচেষ্টার বিরুদ্ধে পথে নেমেছিলেন। বিক্ষোভ মিছিলের কারণে ৯ মার্চ সকালে প্যারিসের বহু রাস্তাই যানজটের কবলে পড়ে।

ফ্রান্সে সামাজিক আন্দোলনগুলিতে ছাত্রদের যোগদান সে দেশের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য। সমাজের যে কোনও স্তরের মানুষের বিক্ষোভে সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও তাদের সংগঠনগুলি যোগ দেয়। উল্লেখ্য হল, এ দিনের বিক্ষোভে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ছাড়াও হাইস্কুলের ব্যাপক সংখ্যক ছাত্রছাত্রী সামিল হয়েছিলেন।

সংবাদে প্রকাশ, আন্দোলনের চাপে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট অল্যান্দে এবং প্রধানমন্ত্রী ম্যানুয়েল ভল্‌স শ্রমিক ও ছাত্র সংগঠনগুলির সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছেন। তাঁদের উদ্দেশ্য শ্রমিক ও ছাত্রদের শ্রম আইনের প্রস্তাবিত পরিবর্তনগুলির পক্ষে নিয়ে আসা। কিন্তু শ্রমিক সংগঠন ও ছাত্র সংগঠনগুলির স্পষ্ট দাবি, প্রস্তাবিত বিলের পরিবর্তন নয়, সরকারকে ওই বিল সরাসরি প্রত্যাহার করতে হবে। দাবি মানা না হলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলবেন তাঁরা।

# কোচবিহারে প্রার্থীর সমর্থনে দেওয়াল লিখন

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.sucicommunist.org